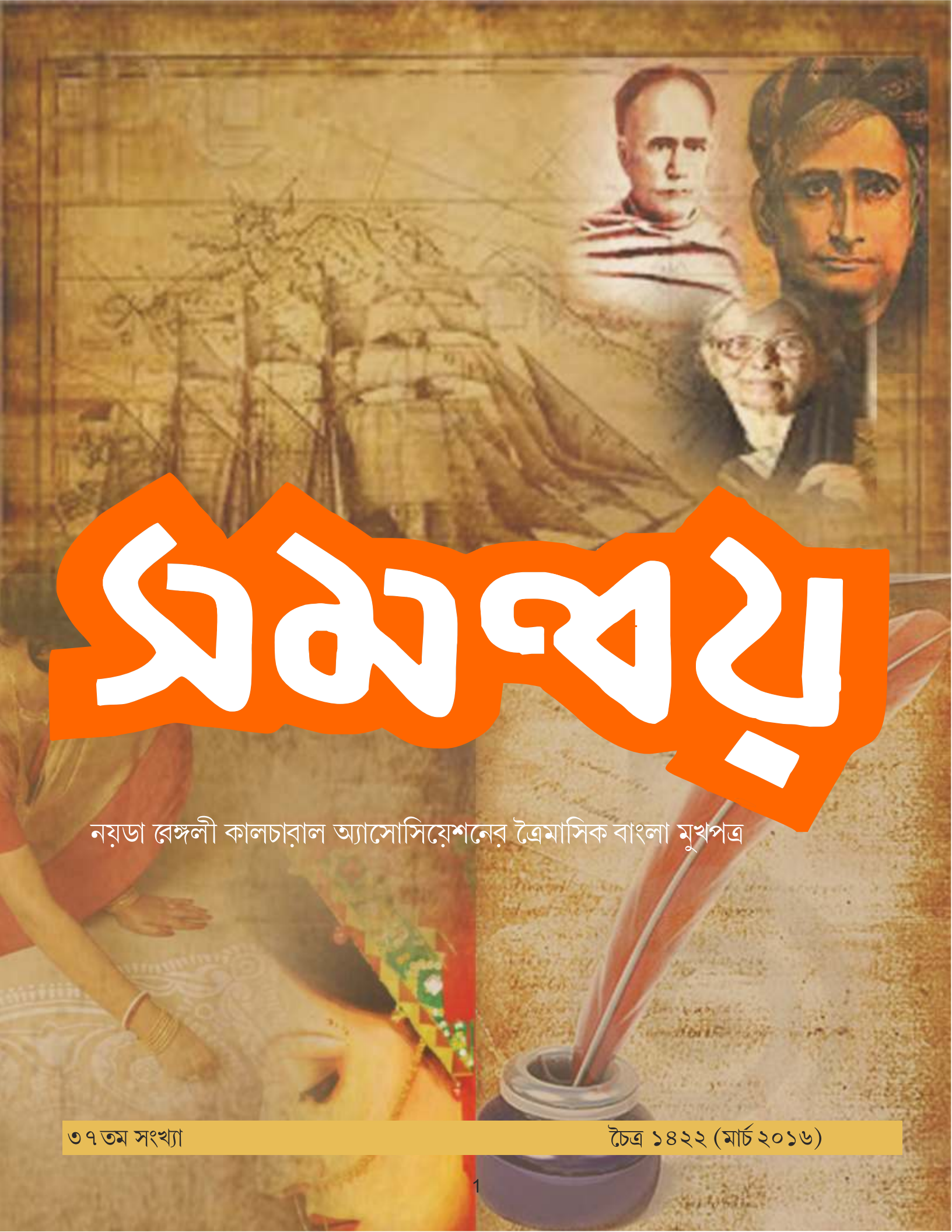

সমন্বয়

নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ত্রৈমাসিক বাংলা মুখপত্র

৩৭তম সংখ্যা

চৈত্র ১৪২২ (মার্চ ২০১৬)

সম্পাদকীয়

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'। কবিগুরুর সেই বিখ্যাত গানের মুখবন্ধ বাঙালির জীবনে জনপ্রিয় এবং প্রাসঙ্গিক। বসন্তের আগমনে মানুষের মন আর প্রকৃতিতে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া, শীতের জরাগ্রস্ততা কাটিয়ে স্নিগ্ধ সবুজ নতুন কচি কচিপাতায় ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে রিক্ত বৃক্ষরাজি। দক্ষিণ সমীরণে শিহরণ জেগেছে যেমন প্রকৃতির লতায় পাতায় তেমনি মানুষের মনে। প্রকৃতিকে নবযৌবনের নতুন নতুন রঙে ভরে দিয়েছে পারুল, মাধবী, মালতি, পলাশ, শিমূল আর কৃষ্ণচূড়া। আমের মুকুলে ভরে গেছে নতুন সবুজ শ্যামলিমায় ভরা আমের গাছ। কোকিলের কুহুতান দিকে দিকে শোনায় পরিবর্তনের গান।

পরিবর্তনের ডাকে আজ সেজে উঠেছে আমাদের সংগঠন, পুরোনো কর্মসমিতি ঘোষণা করেছে তাদের বিদায়বার্তা, এটাই তো চলমান জীবনের গান । পুরোনোকে একদিন স্বাগত জানাতে হবে নতুনের প্রকাশকে । নয়ডা বাঙালি সাংস্কৃতিক সংগঠন গঠিত করতে চলেছে নতুন কর্মসমিতি, নতুন কর্মসূচী নিয়ে। আমাদের সম্পাদকমণ্ডলীর কার্য্যক্রমও এই সাথেই শেষ হবে। আজকের এই অবসরে আমাদেরও কিছু কথা আমরা সকলপাঠকবর্গ এবং আমাদের সংগঠনের সকল সদস্যকে জানাতে চাই । গত দু বছর ধরে বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলী পরিপূর্ণভাবে প্রয়াস করেছে আমাদের পত্রিকা 'সমন্বয়'কে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার- এই মুখপত্রকে সমৃদ্ধ করার । আমাদের প্রথম প্রয়াস ছিল এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাকে নিয়মিত প্রকাশ করা, বিভিন্ন স্থানীয় লেখক-লেখিকাদের সমৃদ্ধ সংযোজনে। নতুন নতুন বিভাগ সংযোজিত হয়েছে এই পত্রিকায় । নতুন বিভাগগুলি হল, ভ্রমণকাহিনী, আধ্যাত্মিক, বঙ্গ সাহিত্যের অবধারক পরিচিতি, রাঁধুনির হেঁসেল, শব্দজব্দ (Soduku), আপনি কি জানেন? এছাড়াও থাকে গল্প-কবিতা-রম্যরচনা এবং আমাদের কার্যক্রমের কিছু ছবি। নতুন করে সাজানো হয়েছে প্রচ্ছদপট, পাঠকদের ভাললাগার ওপরই নির্ভর করে আমাদের সফলতা।

একটি পত্রিকাকে আকর্ষক করে তোলার জন্য চাই তার পৃষ্ঠপোষকতা, শুধুমাত্র আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দিলেই কাজ সম্পূর্ণ হয় না, নতুন নতুন লেখার দরকার। তারজন্য তৈরি করা উচিত একটি কোষাগার - বিভিন্ন ধরনের লেখার কোষাগার । আমাদের সদস্যদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা লিখতে পারেন বা লিখতে চান। কোনো জায়গায় সেটা শুধু আরম্ভ করা । এই ভাবনাটারও পৃষ্ঠপোষকতা দরকার আর তারজন্য দরকার পাঠকের মানসিকতা, তাই সকল সদস্যদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ নিবেদন যে তাঁরা নিয়মত পত্রিকাটি পড়ুন । এই 'সমন্বয়' পত্রিকার প্রকাশের দায়িত্ব পালন করছে আমাদের সংগঠন, নয়ডা বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। বিনামূল্যেই এই পত্রিকার বিতরণের ব্যবস্থা আছে। সদস্যদের শুধু নিয়ত কার্য্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রেখে এর সংখ্যা তুলে নিতে হবে। সম্পাদকমণ্ডলী আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করে পাঠকদের গঠনাত্মক মতামত জানতে, প্রকাশিত লেখনির উপর । তারই মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে চাই।

আমাদের পুরোনো কর্মসমিতির বিদায় লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। আমরা নতুন কর্মসমিতিকে সাদর আহ্বান জানাই। আমাদের শুধু একটাই দাবী থাকবে নতুন কর্মসমিতির কাছে, তাঁরা যেন এই 'সমন্বয়' পত্রিকাকে দূরে সরিয়ে না রাখেন। তাদের চেতনা বরং আরও দৃপ্ত হোক। এই সমন্বয় পত্রিকার নামকরণ যেন আমরা সার্থক করতে পারি আগামী দিনে। নতুন পরিচালক গোষ্ঠী নতুন নতুন চিন্তাধারায় সব সমাজের মানুষকে সমন্বয় করুক। বঙ্গ সংস্কৃতি বাংলার বাইরেও নতুন প্রজন্মকে সমন্বয় করুক। এই শুভকামনা নিয়ে আমরা, বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলি, আমাদের কার্য্যক্রম শেষ করেছি। সকলের ভাল হোক, শুভমস্তু!

দিন কেটে সপ্তাহ গেল
মাস কেটে গেল বছর
চলে গেল ফুড়ুৎ করে
রাখিনি সময়ের খবর

কষ্ট, আনন্দ হতাশা
অতীত হয়ে যাবে
আনন্দ-কষ্টের রেশটুকু
স্মৃতি হয়ে রবে

নতুন দিনের নতুন আলো
নিলাম গ্রহণ করে
পুরোনো সব হতাশা
ফেলে দিলাম ঝেড়ে।

সাফল্য যেন উপছে পড়ে
সব মানুষের জীবনে
নাইবা আসি উপকারে
অপকার না থাকে মনে।

নতুন দিনের নতুন আশায়
শুরু হোক নতুন সফর
সমন্বয়ের সুরে মোরা
রাঙিয়ে তুলি নতুন প্রহর।

যজ্ঞ

সনাতন মুখার্জী

সকল সময় আমরা কিছু পাওয়ার আশায় ব্যস্ত থাকি। কিছু পেতে গেলে কিছুতো করতেই হয়। কোন সম্পদ বা সমৃদ্ধি লাভের আশায়, শত্রুক্ষয় বা যুদ্ধ জয়ের আশায়, আরোগ্য বা স্বর্গ ইত্যাদি কামনা করে দেবতার উদ্দেশ্যে নতি জ্ঞাপন ও আহুতি প্রদানের নাম যজ্ঞ। এটি আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে গুলিতে মুখ্যত যজ্ঞের বিবরণ আছে। ইন্দ্র-অগ্নি-বিষ্ণু-রুদ্র ইত্যাদি বৈদিক দেবতার উদ্দেশ্যে যে জিনিস দেওয়া হয় তার নাম হব্য এবং দেবার নাম আহুতি, আহুতি দেওয়া হয় আগুনে। এই আগুন পূঞ্জিত দেবতার কাছে হব্য বহন করে নিয়ে যায়।

মহাপূজায় বলি ও হোমের প্রাধান্য। বলি ও হোম ছাড়া মহাপূজা হয় না, সাধারণ পূজা সমাপ্ত হওয়ার পর বলিদানের প্রথা। বলি শেষে যজ্ঞের মাধ্যমে পূজা সমাপ্তি। যাগযজ্ঞের মাধ্যমে দেবতাদের সন্তুষ্টি করা হয়। আরাধ্যদেবতার সন্তুষ্টির পর দৈবিক শক্তি প্রাপ্তি হলে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সকলবিধ প্রাপ্তি সম্ভব হয়।

সেইজন্য প্রাচীনকাল থেকে বলি ও হোমের ব্যবস্থা চলে আসছে। যজ্ঞ বলতে সাধারণত বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ বোঝায়। প্রত্যেক দেবতার পৃথক পৃথক আহ্বান মন্ত্র আছে। পৃথক পৃথক দ্রব্যের আহুতির ব্যবস্থা আছে। ব্যক্তির সকাম কামনা অনুসারে দ্রব্যগুলির ব্যবহার হয়। যথা সময়ে সেগুলি যথোক্ত ফল দান করে।

এই সকল যাগযজ্ঞ স্বর্গাদি ফলপ্রদ বটে কিন্তু উহা মোক্ষপ্রদ নহে। ইহা সকাম কর্ম। মনে রাখতে হবে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড সমস্তই রূপাত্মক, যজ্ঞের মূল কথা -পরার্থে, লোকরক্ষার্থে, ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষার্থে আত্মোৎসর্গ। ত্যাগ, এইরূপ ত্যাগের দ্বারা, পরস্পর আদান-প্রদানের দ্বারাই লোকরক্ষা হয়।

বলি শব্দের অর্থ উৎসর্গ বা সমর্পণ। যজ্ঞশব্দের অর্থ ত্যাগ, আমাদের যে ষড়রিপু আছে তাকে আগে সমর্পন করতে পারলে (বলি হলে) তবে যজ্ঞ আরম্ভ হয়।

ষড়রিপু

১। কাম - বিষয়ের প্রতি অভিলাস = ইচ্ছা, তার প্রতীক ছাগ

২। ক্রোধ - হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতা = তার প্রতীক মহিষ

৩। লোভ- বিচার হীনতা = তার প্রতীক মেষ

৪। মোহ- বিপর্যয় বুদ্ধি - তার প্রতীক কুষ্মাণ্ড

৫। মদ - অহংকার - তার প্রতীক কলা

৬। মাৎশর্য্য - উৎফুল্লিত হওয়া - তার প্রতীক ঈক্ষু

এই ষড়রিপু বলি দেওয়া অর্থাৎ ঈশ্বর পদে উৎসর্গ করা হলে যজ্ঞকার্য আরম্ভ হয়। অর্থাৎ ত্যাগ সম্ভব হয়। ত্যাগের ভাবে কর্মানুষ্ঠান করা। এইরূপ কর্মানুষ্ঠান যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তখন মানব জীবন একটি মহাযজ্ঞের আকার ধারণ করে। সেই যজ্ঞের বেদী জগতের হিত, ত্যাগ, আত্মবলিদান, এবং যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং ভগবান। জীব যখন বুঝতে পারে যে কর্ম ঈশ্বরের, তিনিই সর্বকর্মের নিয়ন্তা, যজ্ঞ তপস্যার ভোক্তা। এইরূপ জ্ঞানে যখন সর্ব কর্ম তাঁকে উৎসর্গ করতে পারে তখনই গীতোক্ত যজ্ঞার্থ কর্ম হয়। এইরূপ কর্মে বন্ধন হয় না, অন্য সব কর্ম বন্ধনের কারণ। শুধু বেদোক্ত যজ্ঞাদি এবং সামাজিক কর্তব্য কর্ম নহে সকল কর্মই যজ্ঞার্থ কর্ম করা যাইতে পারে। যজ্ঞে পুজ যজ্ঞেশ্বরে। ওম্ শান্তি।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের মা ও মাসী

সনৎ চক্রবর্তী

দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মন্দির ঠাকুর রামকৃষ্ণের শক্তি ও সাধনার কেন্দ্রবিন্দু। রামকৃষ্ণের এই মা ভবতারিণীর কথা প্রায় সকলেরই জানা।

যতদূর জানা গেছে মা ভবতারিণীর দুই জ্যেষ্ঠা সহোদরা বর্তমান। একজন কৃপাময়ী, অপরজন ব্রহ্মময়ী।

বরানগর কুঠীঘাটের উত্তরে জয়মিত্র কালীবাড়ি। পুরাতন 'হোমার জুট প্রেস' এর পুরাতন জীর্ণ জেটীর উত্তরে অবস্থিত এই ঘাট। শোভাবাজারের জমিদার রামচন্দ্র মিত্রের ত্যাজ্য পুত্র দানশীল জয়নারায়ণ মিত্র কর্ত্তৃক নির্মিত এবং তাঁর নামানুসারেই এই ঘাট। ঠিকানা ৩৯ হরকুমার ঠাকুর স্ট্রান্ড রোড, বরানগর। ১৮৫১-৫২ সালের চৈত্র সংক্রান্তিতে জয়নারায়ণ মিত্র মশায় এই কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার পূর্বে জয়নারায়ণ মিত্র জমি টি ওলন্দাজ জেমস প্যাটেলের কাছ থেকে ক্রয় করেন। তার আগে এখানে Dutch Kuti ছিল। মন্দিরের আরাধ্যা দেবী হলেন — কৃপাময়ী কালী। এই মন্দিরের শিল্পরীতি হল নবরত্ন। একেবারে শীর্ষে একটি চূড়া ও পরের ধাপে চারটি এবং তার নীচের ধাপে চারটি মোট নয়টি চূড়া বিশিষ্ট বলে একে নবরত্ন মন্দির বলা হয়। মন্দির প্রাঙ্গণের প্রবেশ পথের প্রতি পাশে ছয়টি করে বারোটি শিব মন্দির বর্তমান। জয়মিত্র কালীবাড়ি থেকে দক্ষিণে গঙ্গার তীর ধরে এগিয়ে গেলে বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির সীমা রেখা। কাশিপুর ও বরানগরের সীমা রেখায় প্রামাণিক ঘাট রোড। বরানগর অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু দে প্রামাণিক পরিবারের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ দুর্গা প্রসাদের এবং রামগোপালদের বিশেষ উদ্যোগে ১২৫৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পুণ্য সলিলা ভাগীরথীর তীরে দক্ষিণা কালিকা ব্রহ্মময়ীর মূর্তি ও চারটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবেশ পথের দুপাশে প্রথমে দুটি ছোট, পরে দুটি বড় শিব মন্দির এবং তার পরে কালী মন্দির। বাংলার আট চালা রীতি অনুসারে এই মন্দির নির্মিত। উচ্চতার উর্দ্ধক্রম অনুসারে সাজালে দেখা যায় সবচেয়ে

বড় ভবতারিণী, তারপর ব্রহ্মময়ী এবং সবচেয়ে ছোট কৃপাময়ী । ভাস্কর নবীন পাল এই তিনটি মূর্তিরই রূপকার। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেছে এক খণ্ড বৃহৎ কষ্টিপাথর থেকেই নির্মিত এই তিনটি কালী মূর্তি। কথিত আছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর লীলাময় জীবনে গঙ্গার ধার বরাবর দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের পথে কৃপাময়ী ও ব্রহ্মময়ীর মন্দিরে যেতেন এবং মন্দিরের আরাধ্যাদেবীদের মাসী বলে সম্বোধন করতেন।

সরগম্

তপন গঙ্গোপাধ্যায়

মোদের গরব, মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা...

আমি বাংলার গান গাই, আমি বাংলায় গান গাই। তাই ছুটে যাই একটু সুযোগ পেলে সদ্ব্যবহার করতে ভাল কোনও প্রোগ্রামের আমন্ত্রণ। বলুন তো মনের ক্ষুধাকে যদি মেটানো যায় নিজেকে দেখবেন আয়নার সামনে রেখে কতটা তরতাজা - এক নতুন জৌলুস - বয়সটা যেন দূরে সরে গেছে। লোকেরা কত চেষ্টা করছে নিজেকে ধরে রাখতে - তার কত আয়োজন। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সবাই অফারের পর অফার দিয়ে যাচ্ছে। গত পরশু শেষ যেটা পেয়েছি— আমাদের প্রথিতযশা ভরদ্বাজ গোত্র্য বাঙালির কাছ থেকে - একেবারে আধাখরচে নিজেকে সাজিয়ে নাও — লোভ সংবরণ করা মুস্কিল।

এবার প্রসঙ্গান্তরে আসি। সব খেলার সেরা বাঙালির এই ফুটবল - ভেবে যেমন আগে সবাই মজে থাকত, আলোচনার মুখ্য ভাগ ফুটবলের আবর্তে ঘেরা। ছোটবেলা থেকে একই ছবি দেখে বড় হয়েছি। আজ চারিদিকে কংক্রীটের জঙ্গল - শ্বাস নেওয়ার জায়গা নেই। একটু কান পাতলেই শুনতে পাবেন — একটা চাপা গুঞ্জন, নেবুলাইজারের ফিস ফিস শব্দ। অলিতে গলিতে টেনিসের দুর্দণ্ড প্রতাপ, আর ময়দানে লাল-নীল-হলুদ-সবুজের মেলা, সে সব এখন স্মৃতির মণিকোঠায় ভিড় করে আছে। বাংলা বছরের শুরু থেকে প্রথম ছ'মাস খেলা নিয়ে মেতে থাকা - তাই মন বিবাগী হওয়ার অবকাশ ছিল না। ফুটবলার এদের মধ্যে গুটিকতক থাকলেও — আলোচকের অভাব নেই। এমন একটা সাবজেক্ট কমবেশি সবাই অল্পবিস্তর দক্ষ। আর কিছু জ্ঞান পিপাসু বড় বড় চোখ করে, মনের অজান্তে ঠোঁট দুটো কখন ফাঁক হয়ে গেছে বুঝতে পারে নি - শুনে যাচ্ছে। এ-তো পেটের ক্ষিদে নয় - মনের ক্ষিদে, যেন তৃপ্ত হতেই চায় না। খেয়ে যাও... খেয়ে যাও - আর দাদাদের গুণ গেয়ে যাও।

ভাবতে পারছেন এত বড় একটা ইস্যু থেকে আজ আমরা সাইড লাইন হয়ে গিয়েছি। খেলা নেই, সেটা বড় কথা নয়, মুস্কিলটা হচ্ছে কোনও কর্মব্যস্ততাও নেই। মনে পড়ে যায় গানের লাইনগুলো —

এ ব্যাথা কী যে ব্যাথা, বোঝে কী আনজনে
সজনী আমি বুঝি মরেছি মনে মনে
একে তো ফাগুন মাস, দারুণ এ সময় —

চারিদিকে পাতা ঝরে যাচ্ছে। কেমন জানি গাছগুল সব রুক্ষ, শুষ্ক হয়ে কঙ্কালসার হয়ে গিলে খেতে আসছে। মনকে বোঝাই — এটাই আসল রূপ নয় - একটু সবুর কর—দেখবে আবার আসবে ছোট ছোট নতুন পাতা, শোনা যাবে ভ্রমরের গুঞ্জন — আর তারই মাঝে আসবে মনের জোয়ার। নতুন কথা ও কবিতায় সৃষ্টি হবে পরবর্তী অধ্যায়।

আমাদের একটা বদনাম আছে, যে যতই আমি শোরগোল তুলে প্রচার করতে চাই মনের ক্ষুধা মেটানোর তাড়নায় বাঙালি বড় বেশি কাতর — পেটের খিদে, ওটা তো ওপরওয়ালার আশীর্বাদে, চিন্তার বিষয় নয়। নিন্দুকেরা এটা মানতে রাজী নয়। ওদের হিসেব সঙ্গীত সাধনা, জ্ঞান বিজ্ঞান — এইসব বড় বড় কথার আড়ালে আসল রহস্যটা কী জানেন — পি.এন.পি.সি'তে আঙ্গুল চলে ফেসবুকে।

বলেন কী? ভাল করে শুনুন - দেখবেন 'পরনিন্দা-পরচর্চায়' সময় শেষ। কাজের চেয়ে অকাজের দিনলিপিতে ডায়েরীর পাতা ভরা। এমনিতে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ — তার ওপর বিয়েবাড়ী, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, উপলক্ষের শেষ নেই। পেটপুরে খাওয়া - সবসময় ভুলে যায় যে পেটটা আমার, গোলমাল হলেও দুদিনের তরে বসে যাওয়া। কিন্তু ওই যে দৃষ্টি খিদে — সাজানো সামনে মহাভোজের ছাপান্ন ব্যঞ্জন - কী করে দূরে সরিয়ে রাখা যায়। মনকে প্রবোধ দেয় নিজেই, 'খেয়ে যাও - খেয়ে যাও'। তারপর যেমন চাই, তেমনই চাই মুঠো মুঠো হজমের বড়ি। তানাহলে রাস্তায় বেরুলে একদিকে চপ-কাটলেট মোমো-রোলের দোকান। অন্যদিকে সারিসারি ওষুধের (কেমিস্ট শপ্), কারণ অম্বল আমাশয় থেকে বাঙালিকে রক্ষা করবে কে? একে অপরের পরিপূরক।

এত আলোচনা সমালোচনার মাঝে আমার কিন্তু এখনও মনে হয় - দিল্লির রুক্ষতা আজও আমাকে পুরোপুরি কাবু করতে পারেনি, নিজেকে মেলে ধরার ও ভাবনাকে প্রকাশ করার বেশ কিছু আয়োজন - শুধু হদিশ করে নিতে হয় — তারপরেই হারিয়ে যাওয়া ভাবসাগরে। প্রতিধ্বনিত হয় দূর থেকে শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা - ভূপেন হাজারিকার কণ্ঠে

'গঙ্গা আমার মা... পদ্মা আমার মা...
ও আমার দুই চোখে দুই জলের ধারা
মেঘনা যমুনা...
গঙ্গা আমার মা... পদ্মা আমার মা..
একই আকাশ, একই বাতাস
এক হৃদয়ের একই তো শ্বাস...
দোয়েল কোয়েল পাখীর ঠোঁটে, একই মূর্চ্ছনা
ও আমার দুই চোখে দুই জলের ধারা মেঘনা যমুনা...

সঙ্গীতের ছন্দে দেহে লাগে দোলা। অনুরণিত হয় এক বিশেষ সুর, সেটা আবেগের জড়িয়ে ধরার, নিজের বিশ্বাস ও সৃষ্টিকে। এগিয়ে যেতে হবে - আরও আগে। প্রবাসে বাঙালি পিছিয়ে পড়েনি, চেষ্টা করছে নিজের সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরতে। আর খুঁজতে খুঁজতে মহামূল্য খনিভান্ডারের দূর থেকে আলোকটা দেখে বুঝে নিতে হয় কি বিশালতা ও ব্যাপ্তি - যার ছিঁটেফোঁটা রোশনিতে আমরা মুহ্যমান, কত কিছু আমাদের শেয়ার করার আছে।

আগেকার সেই রকে বসে আড্ডার দিন বিল্ডারের জমানায় শেষ। এখন পালাপালি করে বসে 'অহেতুক আড্ডা'র আসর, সাথে সিঙ্গাড়া বা চপ ও এক পেয়ালা চা (লিকার/চিনি ছাড়া/চালু চা) অবশ্যই পাওনা। বেশ কিছুজনের উপস্থিতিতে সামনে ছোট গল্প/কবিতা পড়া ও নিজের ভাবনাকে মেলে ধরার এ এক অভিনব ব্যবস্থা। কিছুটা সময় এরই মধ্যে পাওয়া যায় হো-হো করে হাসার, যারা পারেন না, হয় পুরো সামনের দাঁত কপাটি মেলে ধরেন, অথবা ফ্যাল ফ্যাল করে বিশ্ব পরিবারকে আলিঙ্গন করার আনন্দে এক অসাধারণ অনুভূতিতে মগ্ন হয়ে যান। হাসিটার আজ বড় অভাব। ছোট থেকে বড় সবাই কেমন যেন পাগলের মতো ছুটে চলেছে। দিন শেষে কাউকে যদি জিজ্ঞেস করি, ভাই আজকের প্রাপ্তিটা/পাওনাটা কি রকম? বিরস বদনে - বিষাদভরা চোখে মুখ থেকে বেরিয়ে এলো - চালিয়ে যাচ্ছি, কিছু যোগ করতে পারলাম না। একটা Big Zero। এই যে শূন্যতায় ভোগার আতঙ্ক — বেড়িয়ে আসুন এর আবর্ত থেকে, আর গলা ছেড়ে গান

যখন কেউ আমাকে পাগল বলে,
তার প্রতিবাদ করি আমি,
যখন তুমি আমায় পাগল বলো,
ধন্য হয় যে সে পাগলামি - ধন্য আমি, ধন্য হে....
পাগল তোমার জন্য হে...।

কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নীলাদ্রি দুয়ারী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালে ১৫ই সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার দেবানন্দপুরগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় আর মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী।

প্রভাশ চন্দ্র ও প্রকাশ চন্দ্র নামে শরৎচন্দ্রের আরও দুই ভাই এবং অনিলা দেবী ও সুশীলা দেবী নামে দুই বোনও ছিলেন। শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল এন্ট্রান্স পাশ করে কিছুদিন এফ.এ. পড়েছিলেন। তিনি অস্থিরচিত্ত, ভবঘুরে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাই অল্প কিছুদিন চাকরী করা ছাড়া আর কখনও কিছুই করেননি।

অভাব অনটনের জন্য তিনি বেশির ভাগ সময় স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের নিয়ে ভাগলপুরে শ্বশুর বাড়িতে থাকতেন। শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল ২৪ পরগণা জেলার হালি শহরে। তিনি ভাগলপুরের কাছারিতে কেরানীর কাজ করতেন এবং সপরিবারে বাস করতেন। শরৎচন্দ্র পড়াশুনা কিছুদিন তাঁরগ্রাম দেবানন্দপুরে ও পরে মাতুলালয় ভাগলপুরে করেন। ১৮৯৪ সালে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে এফ.এ. ক্লাসে ভর্ত্তি হন। কিন্তু ১৮৯৬ সালে অর্থাভাবে পড়াশুনায় ইস্তফা দিতে হয়। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার হাতে খড়ি হয় ভাগলপুরে। এই সময় ভাগলপুরের এক নির্ভীক পরোপকারী, আদর্শ যুবক রাজেন মজুমদারের সঙ্গে মিশে শরৎচন্দ্র পরোপকার মূলক কাজের সঙ্গী হন। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র তাঁর শ্রীকান্ত উপন্যাসে এঁকেই ইন্দ্রনাথ রূপে চিত্রিত করে গেছেন। সেই সময় ভাগলপুরের লোকেরা মিলে এক সাহিত্য সভা গঠন করেন। সপ্তাহে একদিন করে সাহিত্য সভার অধিবেশন হত। সেদিন সভার সভ্যরা যে যার লেখা পড়তেন। শরৎচন্দ্র ওই সভার সভ্য ছিলেন। তাঁর অনেক লেখা যা পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়ে তাঁর যশবৃদ্ধি করেছে তার খসড়া এই সময়ই লেখা। এই সময়েই 'বড়দিদি', 'দেবদাস', 'চন্দ্রনাথ', 'শুভদা', অনুপমার প্রেম' আলোছায়া' 'বোঝা', 'হরিচরণ' প্রভৃতি রচনা হয়েছে।

ইতিমধ্যে ১৮৯৫ সালে শরৎচন্দ্রের মাতা গত হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের পিতা দেবানন্দপুরের ঘরবাড়ি বেচে, এর ওর কাছে চেয়ে চিন্তে কোন রকমে সংসার চালাতেন। হঠাৎ একদিন পিতার উপর অভিমান করে সব ছেড়ে শরৎচন্দ্র নিরুদ্দেশ হয়ে যান এবং সন্ন্যাসী হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। এই ঘুরে বেড়াবার সময় যখন তিনি মজঃফরপুরে আসেন, তখন একদিন তাঁর পিতার মৃত্যুর সংবাদ জানতেপারেন। এই জেনেই তিনি ভাগলপুরে এলেন। এসে কোন রকমে পিতার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে, ভাইবোনদের একটা ব্যবস্থা করেন। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে ভাগ্য অন্বেষণে কোলকাতায় এলেন। ৬ মাস কোলকাতায় চাকরী করার পর ১৯০৩ সালে জানুয়ারী মাসে বর্মামুলুকে যাত্রা করেন। কোলকাতা থেকে বর্মা যাওয়ার সময় তিনি তাঁর একটি গল্প 'মন্দির', 'কুন্তলীন' পুরস্কারের জন্য দাখিল করেযান। গল্পটি প্রথম পুরস্কার পায় এবং 'কুন্তলীন' পুস্তিকামালায় প্রকাশিত হয়।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গেলে কিছুদিন পরে বর্মা রেলওয়ের অডিট অফিসে তাঁর একটা অস্থায়ী চাকরী জোটে। দুবছর পরে এই চাকরিটা চলে যায়। কিছুদিন পর ১৯০৬ সালে আবার একটি চাকরি জোটে পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্টস অফিসে। এর মধ্যে শরৎচন্দ্র কিছুদিন এক ধানের ব্যবসায়ীর সঙ্গে কাজ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার সময় বেশির ভাগ সময়টাই থেকেছেন শহরের উপকণ্ঠে যেখানে শহরের কলকারখানার মিস্ত্রীরা থাকত। শরৎচন্দ্র মিস্ত্রীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করতেন। তিনি তাদের চাকরির দরখাস্ত লিখে দিতেন, বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে দিতেন, অসুখে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন, বিপদে সাহায্যও করতেন। মিস্ত্রীরা শরৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধাভক্তি করত।

চক্রবর্তী উপাধিধারী এক মিস্ত্রীর কন্যা শান্তি দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। শরৎচন্দ্র স্ত্রী শান্তিদেবীকে নিয়ে বেশ সুখেই ছিলেন। তাঁদের একটি পুত্রও হয়। পুত্রের বয়স যখন এক বছর সেই সময় রেঙ্গুনেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে শান্তিদেবী এবং শিশুপুত্র উভয়েরই মৃত্যু হয়। স্ত্রীপুত্রকে হারিয়ে শরৎচন্দ্র তখন গভীর শোকাহত হয়েছিলেন। শান্তিদেবীর মৃত্যুর অনেকদিন

পরে শরৎচন্দ্র ঐ রেঙ্গুনেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। বিবাহের সময় পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম ছিল মোক্ষদা। বিবাহের পর শরৎচন্দ্র তাঁর মোক্ষদা নাম বদলে হিরন্ময়ী নাম দিয়েছিলেন এবং তখন থেকে তাঁর এই নামই প্রচলিত হয়। হিরন্ময়ী দেবী নিঃসন্তান ছিলেন। বিয়ের সময় পর্যন্ত হিরন্ময়ী দেবী লেখাপড়া জানতেন না। পরে শরৎচন্দ্র তাঁকে লিখতে পড়তে শিখিয়ে ছিলেন। হিরন্ময়ী ছেলেবেলা থেকেই শান্তস্বভাবা, সেবা পরায়ন ও ধর্মশীলা ছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে নিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সুখে শান্তিতে কাটিয়ে গেছেন। শরৎচন্দ্র গত হওয়ার পর হিরন্ময়ী দেবী ২৩ বৎসর জীবিত ছিলেন।

মিস্ত্রী পল্লীতে শরৎচন্দ্র একটি কাঠের বাড়ির দোতলায় থাকতেন। ১৯১২ সালে তাঁর বাসার নীচে আগুন লেগে যায়। সেই আগুনে তাঁর কয়েকটি বইএর পাণ্ডুলিপি, কিছু অয়েল পেন্টিং এবং এক সাহেবের কাছ থেকে কেনা একটা লাইব্রেরী সমেত তাঁর বাড়িটিও পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

১৯১২ সালেই একমাসের ছুটি নিয়ে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে কোলকাতায় আসেন। কোলকাতায় সম্পাদকের অনুরোধে রেঙ্গুনে গিয়ে 'রামের সুমতি' বড় গল্পটি লিখে পাঠিয়ে দেন। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয় বড়দিদি।

এগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর সম্পাদক ও প্রকাশকদের অনুরোধে শরৎচন্দ্র লেখাগুলি পাঠাতে থাকেন। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয় 'বিরাজ বৌ', 'বিন্দুর ছেলে', 'পরিণীতা', 'পণ্ডিত মশাই'। ১৯১৫ সালে 'মেজদিদি' ও ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয় 'পল্লী সমাজ', 'চন্দ্রনাথ', 'অরক্ষণীয়া'।

১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে শরৎচন্দ্র হঠাৎ দুরারোগ্য পাফোলা রোগে আক্রান্ত হন। তখন ঠিক করেন অফিসে এক বছর ছুটি নিয়ে কোলকাতায় এসে কবিরাজী চিকিৎসা করাবেন। উপরওলা সাহেব ছুটি না দেওয়ায় শরৎচন্দ্র চাকরিতে ইস্তফা দিয়েই বরাবরের জন্য রেঙ্গুন ছেড়ে চলে আসেন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে সস্ত্রীক এসে হাওড়া জেলার বাজে শিবপুরে বসবাস শুরু করেন, প্রায় ৯ বছর তিনি বাজে শিবপুরে ছিলেন। এখানে থাকাকালীন শরৎচন্দ্র আবার লেখা শুরু করেন। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয় 'শ্রীকান্ত - ১ম পর্ব', 'দেবদাস', 'নিষ্কৃতি', 'কাশীনাথ', 'চরিত্রহীন'। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয় 'স্বামী', 'দত্তা', 'শ্রীকান্ত - ২য় পর্ব' । ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয় 'গৃহদাহ', 'বামুনের মেয়ে' ইত্যাদি। ১৯২৩/২৪ সালে প্রকাশিত হয় 'দেনা পাওনা', 'নববিধান', ১৯২৬ সালে 'হরিলক্ষ্মী' গল্প-সমষ্টি, 'পথের দাবী'। বাজেশিবপুরে থাকার সময় তিনি হাওড়া জেলার সমতাবেড়ে জমি কিনে একটি মাটির বাড়ি করান।

এই বাজে শিবপুরে থাকাকালীন ১৯২১ সালে দেশবন্ধুর আহ্বানে কংগ্রেসে যোগ দেন এবং হাওড়া জেলার কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত একটানা দীর্ঘ ১৬ বছর তিনি হাওড়া জেলার কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। শরৎচন্দ্র অহিংস কংগ্রেসের নেতা হলেও বরাবরই কিন্তু ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রামী বা সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন।

শরৎচন্দ্র হাওড়ার বাজে শিবপুরে থাকার সময়ই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। পরিচয় হয়েছিল জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে বিচিত্রার আসরে।

১৯২৬ সাল নাগাদ হাওড়ার বাজে শিবপুর ছেড়ে শরৎচন্দ্র সমতা বেড়ে বসবাস শুরু করেন। সমতাবেড়ে থাকা কালে ঐ অঞ্চলের দরিদ্র লোকদের অসুখে চিকিৎসা করা তাঁর একটা কাজই হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রোগীদেখে তিনি শুধু ওষুধই দাতব্য করতেন না, অনেকের পথ্যও কিনে দিতেন। বহু দুঃস্থ পরিবারকে, বিশেষ করে অনাথ বিধবাদের মাসিক অর্থ সাহায্যও করতেন।

সমতা বেড়ে থাকা কালীন তাঁর লেখা প্রকাশিত হয় 'শ্রীকান্ত - ৩য় পর্ব, 'ষোড়শী', 'স্বদেশ ও সাহিত্য প্রবন্ধ সংগ্রহ', 'শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব', প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৩ সালে।

সমতাবেড়ে থাকাকালীন শরৎচন্দ্র কোলকাতার বালীগঞ্জে একটি বাড়ি তৈরি করিয়ে ছিলেন। কোলকাতায় বাড়ি হলে তিনি কখনো সমতাবেড়ে কখনো কোলকাতায় এইভাবে কাটাতেন। এই সময়ে তাঁর লেখা 'অনুরাধা', 'সতী', 'পরেশ', 'বিজয়া', (১৯৩৪ সালে) 'বিপ্রদাস', (১৯৩৫ সালে) প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি.লিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। এর আগে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী পদক উপহার দিয়েছিলেন। এসব ছাড়া দেশবাসীও তাঁকে তখন 'অপরাজেয় কথাশিল্পী', 'কথা সাহিত্যিক' এই আখ্যায় বিভূষিত করেছিলেন।

মনে প্রাণে তিনি ছিলেন একজন দরদী মানুষ, মানুষের । এমন কি জীব জন্তুর দুঃখ-দূর্দশা দেখলে বা তাদের দুঃখের কাহিনী শুনলে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়তেন। পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রতিই তাঁর দরদ ছিল বেশি। আবার সমাজের নিষ্ঠুর অত্যাচারে সমাজ পরিত্যক্তা লাঞ্ছিতা ও পতিতা নারীদের প্রতি তাঁর করুনা ছিল আরও বেশি। পতিতা নারীদের ভুল পথে যাওয়ার জন তিনি হৃদয়ে একটা বেদনাও অনুভব করতেন। তাঁর বহু গল্পে ও উপন্যাসে তা প্রকাশ পেয়েছে।

শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষ ক বছর শরীর আদৌ ভাল যাচ্ছিল না। একটা না একটা রোগে ভুগ ছিলেন। কোলকাতার ডাক্তারেরা এক্সরে করে দেখলেন শরৎচন্দ্রের যকৃতে ও পাকস্থলীতে ক্যানসার হয়েছে। অপারেশন করা হলো। কিন্তু শরৎচন্দ্র তার চারদিন পর ১৬ই জানুয়ারী ১৯৩৮ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বৎসর ৪ মাস। তাঁর মৃত্যুর পর কিছু লেখা যেমন 'ছেলে বেলার গল্প'; 'শুভদা', প্রকাশিত হয়।

তাঁর সাহিত্য কর্মকে ঘিরে এ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশটি চলচ্চিত্র বিভিন্ন ভাষায় তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে 'দেবদাস' বাংলা, হিন্দি, তেলেগু ভাষায় আটবার তৈরি হয়েছে। এছাড়া 'পরিণীতা', দুইবার, 'মেজদিদি' অবলম্বনে 'মাঝলি দিদি', 'বিন্দুর ছেলে' অবলম্বনে 'ছোট বহু'। দত্তা ইত্যাদি চলচ্চিত্র তৈরি হয়। এছাড়া তাঁর 'নববিধান' উপন্যাসের টি.ভি. ধারাবাহিক প্রদর্শিত হয়।

দে না বেচে !

কাবেরী ঘোষ

সব বেচা যায় - দে না বেচে !
মায়ের স্নেহ, বাবার শাসন
পূজার থালা, গুরুর আসন,
সব বেচা যায় - দে না বেচে !
দেশের মাটি, আমেরআঁটি,
নেতার বুলি সবই খাঁটি,
সব বেচা যায় দে না বেচে !

চা বাগানে মৃত্যুমিছিল,
কানোরিয়ার শত জুট মিল,
সব বেচা যায় - দে না বেচে !
হাসপাতালের বেডে রুগী,
পেনশনারের ভুক্তভোগী,
সব বেচা যায় - দে না বেচে !

মাকড়সাদের জারিজুরি,
জাল ছড়ানো গলায় দড়ি,
সব বেচা যায় - দে না বেচে !
কবির কলম, গানের বুলি,
শিশুর মনে ঠাকুমার ঝুলি,
সব বেচা যায় - দে না বেচে !

চাষের জমি সাঙ্গ হবে,
নীল আকাশে জমবে শাপ —
গাছের শিকড় উপড়াবি আজ
ধ্বংস নাচছে, যমের বাপ।
কালের কালো করাল থাবায় —
বেচবি আর কি কি বল্,
কত দামে বেচবি তোরা
দেশমায়ের আঁখির জল ?

সকাল ও বিকেল

সম্বিত বোস

তোমারে আমি সকাল বলে ডাকি
কারণ সকাল যেমন বাকি দিনের ছবি
তুমি তেমন আমার দিনলিপি।
এই ভোরের শিশির, শান্ত হাওয়া
আকাশ কোণে একটি নীরব তারা
সবেই আমি তোমায় খুঁজে ফিরি
তোমার আকাশে ভৈরবী সুর চিনি।
তোমায় জুড়ে যে বিরাজ করে
তাকে আমি বিকেল বলে ডাকি।
সে আমার বড়ই প্রিয়
আমার সকল স্বপ্নের উত্তরণ
সারাদিনের এই ছুটে চলা,
ঘাম ঝরিয়ে পাথর কাটা
সব শেষ হয়ে সেই বিকেল আসে,
তার রঙিন আকাশে মেঘের কোলে
আমার দিনের হিসাব থাকে।

ফাঁকি

শুভব্রত ঝা

আজকাল একটা দুঃস্বপ্ন আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়
একটা ভয় আমাকে আঁকড়ে ধরে
আমি ক্রমশঃ কুঁকড়ে যাই
আরও আরও কুঁকড়ে যাই...
আমার কর্তব্য, আমার দায়িত্ব, আমার সম্পর্ক,
আমার চরিত্র, আমার সঞ্চয়, আমার ভালোবাসা
আমায় জাপ্টে ধরে, বলে —
ফাঁকি দিয়েছ তুমি - ফাঁকি !!
আমি চিৎকার করে বলতে চাই
বিশ্বাস করো - আমি চেষ্টা করেছি
ওরা শুনতে চায় না আমার কথা
আরও চেপে ধরে আমাকে
আমার হাঁটু, মাথা, হাত
মিলিয়ে যায় একটা বিন্দুতে —
আমি দৌড়তে থাকি প্রাণপন...
ভারি হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস
সত্যিই কি আমি দিয়েছি ফাঁকি

শান্তির খোঁজে

রিঙ্কি সেন

একটুখানি শান্তির খোঁজে
মন আমার দৌড়ে বেড়ায়।
কোথায় গেলে শান্তি পাবো
মন আমার ভাবছে যে হায়।
একটুখানি বাঁধন ছাড়া -
কিছুটা স্বাধীনভাবে
সংসারের দায়বদ্ধতা ছেড়ে
মন যেতে চায় অনেকদূরে।
অনেকদিন কেটেছে আমার
এই এক বন্দী জীবন
একটুখানি মুক্ত হতে
মন আমার চাইছে এখন।
দেশ থেক দেশান্তরে—
আমি যে যাই হারিয়ে।
একটু খানি শান্তির খোঁজে
পাখি হয়ে যায় যে উড়ে।
এই ভাবে ভাবতে ভাবতে
স্বপ্নের জাল বুনতে থাকি
আবার স্বপ্ন ভঙ্গ হলেই
সেই বাস্তব জীবনে ফিরে আসি।
সংসার গণ্ডির বাইরে সেথায়
একটুখানি শান্তির খোঁজে
যতই আমি ছুটে বেড়াই
সে শান্তি আর পাবো কোথায় ?
সংসারের দায়বদ্ধতা
আষ্টে পিষ্টে বাঁধে এখন
এই বন্ধনকে অগ্রাহ্য করে
পারব কি যেতে কখনও ?
পিছুটান এমন জিনিস
মনটাকে বাঁধে সংসারে
যাওয়ার পথের কাঁটা হয়ে
রাস্তা আমার আটকে থাকে।

অন্য কোথা, অন্য কোনখানে

নীলা মুখার্জী

শুরুতেই বলে রাখি এই আমার প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। বোনঝি রূপা দীর্ঘদিন রাশিয়া প্রবাসিনী। তারই উৎসাহে এবং সাদর আমন্ত্রণেই আমার এই পরিকল্পনা। সেই সঙ্গে আছে আমার মনে মনে একটা অপরিচিত নতুন জায়গা দেখার জন্য উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ। রুশ দেশের ইতিহাস, শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই অপরিসীম কৌতুহল ছিল। বিশেষ করে রাশিয়া হচ্ছে গোগোল, টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি,পুশকিন, চেকভ, মায়াকোভস্কি, গোর্কির জায়গা! সত্যি কথা বলতে কি আমি খুবই অভিভূত হয়েছিলাম এই রকমের একটা সুযোগ জীবনে আসার পর।

অবশেষে ৩০শে মে দিল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলাম যাত্রার লক্ষ্যে। ভোর ৩.৫০ মিনিটে এরোফ্লোট বিমানে রওনা দিলাম মস্কোর উদ্দেশ্যে। খুবই বড় বিমান। বেশির ভাগ যাত্রী বিদেশী। তবে আমাদের দেশেরও অনেকে ছিলেন। বাইরে অন্ধকার কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আস্তে আস্তে সকাল হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত সকাল ৯.৫০ মিনিটে আমাদের বিমান মস্কোয় নামল। ওখানে তখন সকাল সাতটা। আমাদের থেকে ওদের সময় আড়াই ঘন্টা পিছিয়ে। মস্কো বিমানবন্দর দেখলাম খুবই সাধারণ। এখানে রাশিয়ান ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষার চল নেই। যাইহোক এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে ইমিগ্রেশন পর্ব শেষ করে বেরিয়ে এলাম। রূপা ও তার রাশিয়ান স্বামী বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ওদের দেখে কি যে আনন্দ হল - অদ্ভুত অনুভূতি।

এবার আমরা রওনা হলাম শহরের দিকে। চারিদিক দেখছি। যা দেখছি আশ্চর্য লাগছে। গাড়ি ছুটে চলেছে। একটার পর একটা খুব বড় বড় ফ্লাইওভার পেরোচ্ছে। কাতারে কাতারে গাড়ি চলে, কিন্তু কোন শব্দ নেই, ধোঁয়া নেই, নেই ধুলো। দেখছি বৈদ্যুতিক বাস চলছে, ট্রাম চলছে - সব যানবাহনের দরজা বন্ধ, সবই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত।

বাইরে যে দিকে তাকাই সবই সবুজ। রাস্তার দুইদিকে বড় বড় গাছ। শুধুই সবুজের সমারোহ। ঘন সবুজ, ফিকে সবুজ, সাদা সবুজ, হলদে আমেজ দেওয়া সবুজ।

প্রায় ঘন্টা খানেক পরে গাড়ি থামল। একটু কফি আর স্ন্যাক্স খাবার জন্য। দেখলাম একটা বড় হলঘর - একটাই - একতলা। আশেপাশে ফাঁকা জায়গা। (তুলোরমত হাওয়ায় ভাসছে কিছু ফুলের মত জিনিস। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছ ধপধপে সাদা। মনে হচ্ছে বরফ পড়েছে। কিন্তু না তুলোর মত ছোট ছোট ফুল।) বাইরে তখন বেশ ভালো ঠান্ডা।

আরও ঘন্টা খানেক চলার পর ওদের বাড়ি Ulistsa Bakinskayaতে পৌঁছলাম। একই রকম দেখতে, উঁচু উঁচু সব বাড়ি। সামনে কোন জায়গা নেই।

১৬ তলার ওপর ওদের সুন্দর সাজানো ছিমছাম ফ্ল্যাট, ওদের একমাত্র ছেলে দশ বছরের টবি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। তখন খুব ভালো লাগছিল। ফ্ল্যাটের ওপর থেকে যে দিকে তাকাই শুধু সবুজ। মনে হচ্ছে চারিপাশে ঘন জঙ্গল। কিন্তু ওরা বলল, ওগুলো এখানকার পার্ক। বড় বড় গাছ গিয়ে তৈরি। এখানে আকাশের রং গাঢ় নীল।

এরা দিনের বেলা বিশ্রাম নেয় না - নিতে দেয় না। কিছুক্ষণ পরে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম গোর্কি পার্ক দেখতে। এদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে। আমরা মেট্রো স্টেশনে এলাম। এবার আমার অবাক হবার পালা। কি সুন্দর স্টেশন। ভেতরের কারুকার্য, স্থাপত্য শিল্প, নির্মাণ কৌশল দেখার মত। যে কয়েকটা মেট্রো স্টেশন দেখেছি - প্রতিটিতেই নানান ধরনের কাজ। অদ্ভুত সুন্দর। অসম্ভব উঁচু escalator .....উঠছি তো উঠছি আর নামছি তো নামছি। ওখানে ৩০ সেকেন্ড পরপর ট্রেন আসে। শুনলাম রাশিয়ার মেট্রো পৃথিবীর দ্বিতীয় মেট্রো। ১৯২৫/২৬ খৃষ্টাব্দে তৈরি হয়েছে। দেখে মনে হবে না এত পুরনো। প্রতিটি কামরা ঝকঝক করছে - সুন্দর, পরিস্কার।

মস্কো শহর নিভা বা লেনা নদীর ধারে। বিশাল নদী। নদীর পাড় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ২ পাশে চওড়া চওড়া পায়ে চলার রাস্তা। মাঝখানের রাস্তা গাড়ি চলার জন্য। আমরা খুব বড় একটা ব্রিজ পেরিয়ে গোর্কি পার্কে পৌঁছলাম। এখানে পার্কে বড় বড় নানান ফলের গাছ, মাঝখানে সুন্দর সবুজ লন। কোথাও বাঁধানো রাস্তা, কোথাও কাঁচা রাস্তা। তৈরি হয়েছে কৃত্রিম লেক। সুন্দর করে তৈরি করা মিউজিক্যাল ফাউন্টেন। মনে হচ্ছে ফোয়ারা যেন বাজনার তালে তালে নেচে চলেছে। পার্কের একদিকে গান বাজনাও চলছে, অনুষ্ঠানও হচ্ছে। এখন এখানে গরম কাল। বছরের বেশির ভাগ সময় এরা ঠান্ডা আর বরফের মধ্যে কাটায়। তাই এই গরমকালে ছোট-বড় সকলে প্রাণভরে আনন্দ করে। সমস্ত স্কুল তিনমাস বন্ধ থাকে। এরা এই সময় প্রকৃতির সঙ্গকে বেশি করে উপভোগ করে। আজকের রাশিয়া অনেক বদলে গেছে। অনেক বড় বড় মল, হোটেল, থিয়েটার হল, চওড়া সাজানো রাস্তা।

সেদিন আমরা একটা মেক্সিকান রেস্তোরাঁতে রাতের খাবার খেলাম। দেখলাম হোটেলের মধ্যে নাচ-গান হৈহৈ চলছে। খাবারও আমার খুব ভালো লাগল। রাত ১২টার পর বাড়ি ফিরলাম তখনও দিনের আলো ঝলমল করছে। চারিদিক গমগম করছে। পরের দিন বেরিয়ে পড়লাম Izic Cathedral দেখতে। সপ্তদশ শতাব্দীতে এখানে রাশিয়ার রাজধানী ছিল। এখানকার ক্যাথিড্রালগুলো দেখতে অনেকটা মসজিদের মত।

তারপর গেলাম Nespate Museum দেখতে। এটা তৈরি হয়েছে Tzar Alexandar II-এর সময়। তখনকার একটা বিশাল হল ঘরে এখন সাজানো হয়েছে বই-এর দোকান।

রাশিয়ার ইতিহাসে Peter the Greatএর নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর তৈরি প্যালেস এখন নাম Kolomenskaye Museum, চারিদিকে ফলের বাগান - আপেল, পাম, চেরির গাছ, বিশাল পার্ক। বহুলোক ঘুরছে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কেউ কিছুতেই হাত দেয় না।

পরের দর্শনীয় Danskaya Monastery। অপূর্ব এর কারুকার্য। এখানে খুব পুরনো একটা বিশাল হল ঘরে ঢুকলাম - কড়ি-বরগার তৈরি। দরজা-জানালা মোটা কাঠের তৈরি। আজ এখানে এরা বাজার করেছে - নানান জিনিস বিক্রি হচ্ছে।

এলাম Moscow Centre-এ। কি সুন্দর চওড়া সাজানো রাস্তা। মাঝে মাঝে বাঁধানো চত্বর। ফুলের বাগান। এখানেই Kremlin প্রেসিডেন্টের কার্যালয়। চারিপাশে পার্ক আর কৃত্রিম অরণ্য। কাছেই রেডস্কোয়ার। এখানেই তৈরি হয়েছে মস্কোর সেন্ট বেসিলস চ্যাপেল।

আর একটু এগিয়ে একটা প্রাসাদ, তাতে আজ তৈরি হয়েছে বড় বড় মল, রেস্টুরেন্ট। এখানে আমরা একটা রাশিয়ান হোটেলে গেলাম। এখানে a-la-cart system. একটা track এর ওপর দিয়ে প্লেট এগিয়ে চলছে, কাঁচের বাক্সের ভেতর থেকে পছন্দ মত খাবার নিতে নিতে এগিয়ে যাচ্ছি — সব শেষে বিল মিটিয়ে প্লেট তুলে নিলাম। খুব মজা লাগল। কিন্তু রাশিয়ান খাবার আমার বিশেষ ভালো লাগেনি। এটা অবশ্যই রুচি এবং অভ্যাসের ব্যাপার। এখানে একটা ভারতীয় ভোজনালয়েও গেলাম। নাম Park Palace। আলো ঝলমল করছে। ঢুকতেই হিন্দি ভাষায় আপ্যায়ন। হোটেলের মালিক বাঙালি। চন্দননগরের ছেলে, নাম তন্ময়। একজন বাঙালি ওইভাবে ব্যবসা করছে বিদেশে এসে। দেখে খুব আনন্দ হল। আমার বোনঝি শর্মিলা চ্যাটার্জি ওখানের একটা জার্মান কোম্পানির একজন ডিরেক্টর। ওদের অফিস-এর তিন বছরের সেলিব্রেশনে গিয়েছিলাম। দেখলাম ও কিভাবে নিজের কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করছে। কত প্রশংসা পাচ্ছে। আজ কত বাঙালি পৃথিবীর নানান প্রান্তে কৃতিত্বের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে দেখে খুব গর্ব হল।

এরপর গেলাম বহু প্রাচীন ঐতিহ্যময় মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে। কি সুন্দর ক্যাম্পাস, কি অপূর্ব স্থাপত্য। ক্যাম্পাসের মধ্যেই হোস্টেল এখানে। মেয়েদের হোস্টেল বলে আলাদা কিছু নেই। সবাই এক সঙ্গে মিলেমিশে থাকে।

এছাড়া দেখলাম Maris Palace, Central Exhibition Hall, Science Museum, Marble Palace কয়েকটা fortress, Castle প্রতিটি জায়গাই আমার খুব ভালো লেগেছে। এদের একটা বৈশিষ্ট, এরা পুরনো কিছু নষ্ট করে না - বছরের পর বছর ওগুলোই রক্ষণাবেক্ষণ করে একইভাবে রেখেছে।

এরপর আমাদের গন্তব্য সেন্ট পিটার্সবার্গ, আগের নাম ছিল লেনিনগ্রাদ। রাশিয়ার পুরনো রাজধানী। এইখানে বলে নেওয়া ভাল সেন্ট পিটার্সবার্গ রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। ২৭শে মে, ১৭০৩ সালে Tzar পিটার দি গ্রেট এর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৪ সালে এই শহরের নাম বদলে সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে Petrograd রাখা হয়েছিল। ১৯২৪ সালে রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর কালে একই শহরের নাম রাখা হয় লেনিনগ্রাদ। আসলে ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর বলশেভিকরা ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখলের পর কমিউনিস্ট শাসন জারি করে সোভিয়েত দেশে। সেই লেনিনগ্রাদ শহরই আবার ১৯৯১ সালে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পুরানো নাম সেন্ট পিটার্সবার্গ ফিরে পায়।

আমরা বুলেট ট্রেনে উঠলাম। ঘন্টায় ২৫০ মাইল বেগে চলে। ভেতরে বসে বোঝা যাচ্ছে না ট্রেন চলছে। বাইরের দৃশ্য অপূর্ব। যতই এগোতে লাগলাম প্রাকৃতিক দশ্য পাল্টাতে লাগল। অত বড় বড় ঘন গাছ নেই, নেই অত সবুজের সমারোহ। আকাশের রং আরও বেশি নীল। এখানের রেলওয়ে স্টেশনগুলো ঠিক এয়ারপোর্টের মত। খুব সুন্দর। বিকেলে এখানে এসে আমরা এলাম সিটি ট্যুর-এর খোঁজে। এখানের ভাষা শুধু রাশিয়ান, তবে রোজ একটা করে excursion ইংরেজিতে হয়।

প্যালেস-এর বাইরে অসংখ্য মার্বেল-এর মূর্তি, ঝর্ণা, ফুলের বাগান, সুন্দর সবুজে ঢাকা লন আরও কত কি। পরের দিন আমরা দেখতে গেলাম Pushkin-এটা রানী Catherina-র নিজস্ব প্যালেস। এখানে ছবি তোলা যায়। প্রতিটি ঘরের দেওয়ালে তখনকার তৈরি চাইনিজ পেইন্টিং। রাজা রানী রাজ পরিবারের চোখ ধাঁধানো ব্যবহৃত জিনিস। এখানে বাইরের কোন ঝরণা বা মূর্তি ছিল না। ছিল সুন্দর বাগান।

কোনদিন ভুলতে পারব না তিন ঘন্টার রাশিয়ান ব্যালে। প্রায় ১৫০০ লোক একসঙ্গে এই ব্যালে দেখলাম। সেইদিনই রাত ১২টায় Cruiseএ বেরিয়ে পড়লাম রাতের সেন্ট পিটার্সবার্গ দেখতে। নদীর জলের রং কুচকুচে কালো। একটু অন্ধকার হতেই সারা শহর আলোয় সেজে উঠল। কালো নদীর জলে আলো ঝলমল শহরের দৃশ্য অপূর্ব।

বিশাল নদী। বড় বড় ব্রিজ। রাত দেড়টার থেকে একটার পর একটা ব্রিজ খুলে যেতে লাগল - মাঝখান দিয়ে বড় বড় জাহাজ পেরিয়ে যেতে লাগল। প্রায় ঘন্টা খানেক দেখার পর আবার আমরা শহরে ফিরে এলাম। তখন ভোর চারটে। রাত শেষে ভোর হল কিন্তু সূর্য অস্ত গেল না। জুন মাসের নয় তারিখ থেকে পঞ্চাশ দিন এখানে White Night থাকে। রাত হয় না।

দেখলাম সেন্ট পিটার্সবার্গ ইউনির্ভাসিটি। এখানের ছাত্র ছিলেন রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সুন্দর সাজানো বিশ্ববিদ্যালয়। এখানেই দেখলাম শান্ত সুন্দর বাল্টিক সাগর (Baltic Sea)।

পাঁচদিন সেন্ট পিটার্সবার্গ-এ কাটিয়ে আবার ফিরে এলাম মস্কো শহরে। হাতে ২দিন সময়। আগেই বলেছি এরা বিশ্রাম নেয় না - নিতে দেয় না।

আবার বেরিয়ে পড়লাম মস্কো শহর ঘুরতে। দেখলাম রাস্তা দিয়ে নানান লোক চলছে। সবাই যে ফিটফাট তা নয়। তবে কোন মানুষই যাতে নিঃসহায় আর নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্য এখানে প্রচুর আয়োজন, বিপুল উদ্যম।

শুনলাম এখানে ১৮ বছরে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার দায়িত্ব থাকে তাদের বাবা মায়ের ওপর। কিন্তু তাদের কিভাবে দেখাশোনা করা হয় স্টেট সে সম্বন্ধে সচেতন থাকে। ওখানে ছেলেমেয়েদের সমস্ত রকম শিক্ষার ব্যয়ভার সরকার বহন করে। (একটা বিশেষ অর্থনৈতিক মতে সর্বসাধারণকে দীক্ষিত করে জাতি, ধর্ম, শ্রেণী নির্বিশেষে সকলকে মানুষ করার দায়িত্ব আছে সরকারের। সমস্ত মানুষকেই যেন সমানভাবে জাগিয়ে তুলছে।)

এখানে এদের নিজস্ব আলাদা কোন ধর্ম নেই। এরা রুশ সম্রাট কৃত অপমানের হাত থেকে দেশকে বাঁচিয়েছে। এরা বিশ্বাস করে অন্ধ ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভাল। আজ রাশিয়া যে কাজে লেগেছে তা হচ্ছে যুগান্তরের পথ তৈরি। চিরাভ্যাসের আরামকে দূরে রাখা।

সময়ের অভাবে ঐতিহসিক শহর মস্কো আর লেনিনগ্রাদ ছাড়া আর কোথাও যাওয়া হয়নি। মনে ভাবি রাশিয়াকে আর একবার যদি দেখার সুযোগ আসে তার চেয়ে ভাল আর কিছু হয় না।

যে রক্ষক সেই ভক্ষক

সুজিত ব্যানার্জী

ছিঃ ! ছিঃ ! ছোট মুখে বড়ো কথা। তুমি চোখের সামনে দেখছো না সভ্য সমাজ অপরাধ নিয়ে কতো ভাবছে। অন্যায়ের পরেও একটা মৃত্যুদণ্ড নিয়ে দেশ জুড়ে কত হই হট্টগোল হচ্ছে। আপনারা ভাবছেন আপনারা সকলেই সভ্য হয়েছেন। আর আমি যদি বলি আপনারা কি আদৌ সভ্য হয়েছেন? যদি সভ্য হতেন আমার প্রাণদণ্ড নিয়েও চিন্তা করতেন। অনেক বৈজ্ঞানিক দেখিয়ে দিয়েছেন চলমান বস্তুর প্রাণ আছে। বেদনায় অনুভূতি আছে। এতসব জেনেও না জানার অভিনয় দেখে আপনাদের সভ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ হয়। তবে মাঝে মাঝে দুঃখে কিছুটা সান্তনা পাই এই জেনে যে সমাজের কিছু সম্প্রদায় আমাদের কত সম্মান করে। আমাদের প্রাণের মূল্য তাদের কাছে ভগবান তুল্য। অপর সম্প্রদায়ের কাছে আমাদের প্রাণের মূল্য খুবই তুচ্ছ। কথায় কথায় আবার প্রাণ নিয়ে টানাটানি করে।

জমিদার বাড়ির সকলের চোখের মণি ছিলাম আমি, তখন বয়সটা ছোট্ট ছিল, বুঝতাম না কেন সকলে আমায় এত যত্ন করে। কোন না কোন উৎসবে, অজুহাত দেখিয়ে আমাদের অতবড়ো পরিবারের সকলকে প্রাণদণ্ড দিয়েও খান্ত হয়নি জমিদারবাবু। এখন আমার পালা। সামনের আষাঢ় মাসে একমাত্র আদরের নাতিটার অন্নপ্রাশন। বাড়িতে উৎসবের ঘটা দেখেই সকলে বুঝতে পারবে জমিদার বাবু কত সৌখিন ছিলেন। বাইরের যত ভাল খাবার মুখের সামনে রেখে দিন - মুখে তুলবেন না। ঘরের তৈরি শুদ্ধ খাবারে রুচি রাখেন। তাই বাড়ি ভরতি চাকর বাকর সব সময় তটস্থ থাকত। আর পাঁচজনের থেকে আমি কিছুটা আলাদা ছিলাম। জমিদারের আশ্রয়ে থেকে খাওয়া দাওয়ার অভাব কোনদিন বুঝতে পারিনি। না চাইতেই প্রয়োজনের তুলনায় অনেক ভাল ভাল খাবার পেতাম। সামনের সহজ কচি কচি ঘাসের বাগানে ঘুরে বেড়াতাম। কত রকমের ফলে ভরা সুন্দর বাগান। কোন রকমের অন্যায় বা অপরাধ কখনো করেছি বলে মনে পড়ে না। ভাবুন তো নিশ্চিন্ত মৃত্যুর কঠিগড়ায় দাঁড়িয়ে মৃত্যুর জন্য তিলে তিলে অপেক্ষা করা যে কেমন কষ্টকর সেটা যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই বুঝতে পারে। পাপ করলে সাজা হয়, অন্যায় করলে মৃত্যুদণ্ড হয়। আর যেকোন প্রকার পাপ বা অন্যায় করেনি তার কেন মৃত্যুদণ্ড হয়?

তাহলে কি আমার এই পৃথিবীতে জন্মনেওয়াটাই অন্যায়? যে দেশে প্রতি মিনিটে লক্ষ লক্ষ প্রাণদণ্ড দেওয়া হচ্ছে সে দেশে আমার প্রাণের জন্য আপিল করা নেহাতই হাস্যকর। তবুও একবার দেখবেন। আমার কথা চিন্তা করবেন।

চলি, স্নান করে তৈরি হতে হবে। কসাইরা তৈরি আমার এতদিন যত্ন করে তৈরি করা হৃষ্টপুষ্ট দেহটা থেকে এক কোপে মাথাটা আলাদা হয়ে যাবে। ঝাল মশলায় কোষিয়ে ফেলবে রান্না ঘরের ঠাকুর। আলোয় আলোয় ঝলমল করে উঠবে জমিদার বাড়ির চারিদিক। চেটেপুটে তৃপ্তি করে খাবে আমাকে। জমিদার বাড়ির একমাত্র নাতির অন্নপ্রাশন কিনা। ছোট্ট একটি নিবেদন করে আমার দুঃখের কাহিনি এখানেই ইতি টানছি।

'হা - রে - রে - রে - রে - রে...' আমার প্রাণটা নেবে কে - রে?
কেউ কাটবে একই কোপে কেউ কাটবে ঘোষে।
ঝাল মশলায় কষে খাবে মনের সাধে মোরে।
কসাইটা যে বড্ড পাজী ছেড়ে দিতে নয়কো রাজী
কেনা বেচার এই সংসারে যেতে হবে সবাইকে ছেড়ে।
প্রাণ আমার থাকছেনা ভাই, জেনেও কেন দুঃখ পাই।
সবার কাছে দুঃখ জানাই ছাগল হয়ে যেন আর না জন্মাই।।

আপনি কি জানেন?

১. ভারতবর্ষের পুরাতন নাম ছিল জাম্বুদ্বীপ।

২. হ্যারি পটারের লেখিকা জে.কে. রোলিং সারা বিশ্বে প্রথম মানুষ;। যিনি বই লিখে বিলিওনেয়ার হয়েছেন।

৩. সর্বপ্রথম আইসক্রীম উৎপাদিত হয়েছিল চীন দেশে, আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ শতকে হাওয়াইতে । 'আইসক্রীম বীন' নামে একরকম ফল পাওয়া যায় যা খেতে একদম ভ্যানিলা আইসক্রীমের মত। এই ফলটির নাম থেকেই 'আইসক্রীম' নামটি এসেছে।

৪. নরওয়েতে মে মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সূর্য অস্ত যায় না।

৫. যে ব্যক্তি সকলের মাঝে হাঁচি দ্যান, তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন - 'sorry'. আর আশেপাশের লোক বলেন, 'Bless you' এর কারণ হল, যখন হাঁচি দেওয়া হয় তখন এক মিলিসেকেণ্ড-এর জন্যও সেই ব্যক্তির হৃদপিণ্ড থেমে যায়।

৬. 'অলিম্পিক মশাল' প্রথম প্রজ্জ্বলিত করা হয় ১৯২৮ সালে আর্মষ্টার্ডম অলিম্পিকস-এ।

৭. ভেনিজুয়েলাতে সুদৃশ্য জলপ্রপাতগুলির নাম হল 'The Angel Falls'। এই নামটি এসেছিল Jimmy Angel বলে একজন আমেরিক্যান পাইলটের নামে। তাঁর চালিত বিমানটি স্বর্ণখনির সন্ধানে, এই পাহাড়ের শিখরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে পড়ে।

৮. আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচের ইতিহাসে, ইংল্যাণ্ড বা অস্ট্রেলিয়াতে, নতুন বছরের পরের দিন থেকে যে 'Test Match' শুরু হয়, তাকে 'Boxing Day Test' নামে অভিহিত করা হয় । কথাটা এসেছে কানাডা থেকে। ওই দেশের রীতি অনুযায়ী ঐ দিন, ক্রীতদাসদের মালিকরা নিজ নিজ ক্রীতদাসদের একটা বন্ধ বাক্স, উপহার দেন, যার মধ্যে অর্থ বা রত্ন থাকে। ক্রীতদাসদের ঐ বাক্স, ভেঙ্গে ভিতরে রাখা অর্থ বা রত্ন বের করে নিতে হয়। এই দিনটি ওই দেশে ছুটির দিন।

৯. পৃথিবীতে সবথেকে কম সময় যুদ্ধ হয়েছিল ১৮৯৬ সালে। ইংরেজ এবং জাঞ্জিবারের মধ্যে । জাঞ্জিবারের সৈন্যদল মাত্র ৩৮ মিনিটের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে।

১০. "7 up' কথাটার আবিষ্কর্তা একজন এ্যালবিনো। '7' শব্দটা এসেছে, কারণ Original Containerটা ছিল 7 আউন্সের। আর 'Up' কথাটা এসেছে 'Bubble'-এর ঊর্দ্ধমুখী গতি বোঝাতে।

উত্তরণ

বিপ্লব দাশগুপ্ত

ভোলা! .....এই ভোলা একটা চাঁছালো ডাক সামনের রাস্তা থেকে ভেসে আসে। ভোলা গ্যারেজের পিছন দিকে বসে গাড়ির চাকাটা খুলছিল, রিমটা বেঁকে গেছে, চাকার টায়ারটা খুলে রিমটা ঠিক করতে হবে। খুব মনোযোগের সাথে নাটগুলো খুলছিল। আবার জোরে ডাক আসে... ভোলা...! হাতের কাজটা ফেলে রেখে ভোলা ছুটে যায় সামনের রাস্তায়। বাইরে ওর গুরু ... বিকাশ একটা এ্যাম্বাসাডার গাড়ির নীচে শুয়ে আছে। যেখান থেকে চেঁচিয়ে বলে ৪/৬ রেঞ্জ টা দে? ভোলা আবার ছুটে পিছনে যায়। সেখান থেকে রেঞ্জটা নিয়ে বিকাশের হাতে দেয়। ওখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। গুরুতো গাড়ির নীচে শুয়ে... আবার যদি হাঁক দেয় কোনো যন্ত্র আনার জন্য?.....

একটা আধময়লা চেক চেক জামা পরা, পরণে জীনসের ফুল প্যান্ট। পিছনের দিকটা ফেটে গ্যাছে - বেশ ফর্সা দোহারা চেহারা - কালি লাগা হাত, পরিপাটি করে চুলটা আঁচড়ানো, বয়স বছর বারো হবে। এই গ্যারেজে কাজ করছে প্রায় ৪/৫ বছর হয়ে গেল। ওর গুরু বিকাশ এই গ্যারেজের মালিক... বিকাশদাই বলে ভোলা। সে-ই ওকে এনেছিল। একটু দূরেই একটা চায়ের দোকানে কাজ করত... মাচাবাঁধা একটা ছোট রেস্তোরাঁ... ডাল-ভাত খাবারেরও ব্যবস্থা আছে। সকাল-সন্ধ্যা চা বিক্রী হয় ভোলা ওখানে চায়ের কাপ খাবারের এঁটো বাসন ধুত, দরকার হলে খাবার পরিবেশন করত। বদলে দুবেলা পেটভরে খাবার পেত। বিকাশ ওখানে খেতে যেত। সেই থেকে আলাপ, বিকাশকে ভোলা বিকাশদা বলেই ডাকত। দেখতে সুন্দর... মিষ্টি কথা আর সবকিছু জানার ইচ্ছে। ভোলার এইগুণগুলো দেখে বিকাশের ভাল লেগে গেছিল ওকে, তাই একদিন বলেছিল 'তুই আমার সাথে কাজ করবি? মোটর গ্যারেজ... কাজ শিখে নিলে অনেক কামাই করতে পারবি? এখানে এই দুবেলা শুধু পেটপুজো করে কি হবে?' কথাটা ভাল লেগেছিল, ভোলার। তাই একদিন ভোলাকে দিয়েই ওই রেস্তোরাঁর মালিকের সাথে কথা বলিয়েছিল এবং তাকে রাজী করিয়ে ওকে নিজের সাথে নিয়ে এসেছিল এই গ্যারেজে। সেই থেকে ও বিকাশদার সাথে আছে।

ভোলা জানে না ওর বাবা-মা কে... কোথায় ওর ঘর ছিল। শুধু ওর ওই ফর্সা ডান হাতের উপর কেউ উল্কি এঁকে লিখে দিয়েছে 'ভোলানাথ'। ওই লেখা দেকেই সকলে ওকে ভোলা বলে ডাকে। ওর শুধু মনে আছে ও একটা গাজন দলের সাথে ছিল, ওদের সাথে ঘুরে বেড়াত বিভিন্ন জায়গায়। গাছের তলায় শুয়ে রাত কাটাত। যখন খুব ছোট ছিল ও হাঁটতে পারতনা, তখন ওই গাজনদলেরই একজনের কাঁধে কাঁধে চলত। ক্ষিদে পেলে ডালের জল বা ভাতের ফেন জলে ঘুলে খাওয়াত। কখনো কখনো ছাতুগোলাও খেয়েছে। যখন একটু বেড়ে উঠল তখন সকলকে বলতে শুনেছে — রাজপুত্তুর! ও জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমায় রাজপুত্তুর বল কেন?' ওরা বলেছিল 'তুই দেখতে খুব সুন্দর... রাজপুত্তুরের মত, তাই তোকে ওই বলে ডাকি।' একদিন ভোলা একটা আয়নার সামনে নিজেকে প্রথম দেখল। তখন ও সবে চুলে 'আলবট' কাটতে শিখেছে। অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে দেখেছিল ভোলা। এক সময় নিজের মনেই লজ্জা পেয়ে গেছিল আর তখন থেকেই মনে মনে একটা ছোট স্বপ্ন এঁকেছিল — একটা ওরই মত সুন্দর মেয়ে বন্ধু। নিশ্চয়ই ওকে দেখে কোনো মেয়ে পছন্দ করবে। সেই ভোলানাথ দিনের সাথে চলতে চলতে এতগুলো বছর পেরিয়ে এসেছে। বিকাশ ওকে ভীষণ ভালবাসে। হঠাৎ বিকাশ আবার গাড়ির নীচে থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই ভোলা এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস? যা... ভিতরে যা... আমার আর দরকার নেই।

একটু চমকে উঠে ভোলা বিকাশের ডাক শুনে। ওর মনেই ছিল না যে ওর চোখদুটো চলে গেছে অনেক দূরে দুটো বকুল গাছের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় একটা সাদা পাথরের দেয়ালে ঘেরা তিনতলা বাড়ি। কি সুন্দর সাজানো বাড়ি, রোজ সকালে ওই বাড়িতে যায় ভোলা। ওদের তিনটি গাড়ি আছে, সেই গাড়ি ধোয়ার ভার ওর উপরে। অনেকক্ষণ সময় লাগায় ভোলা ওই গাড়ি তিনটি পরিস্কার করতে — ঘষে ঘষে একেবারে চমকে দেয়। ভোলার সময় নেবার আর একটা কারনও আছে। ওই বাড়িতে একটি সুন্দর মেয়ে আছে। ভোলা ওকে মেমসাব বলে। সকালবেলা বেল বাজালে ওই মেয়েটিই তো গাড়ির চাবি এনে দেয়। ওই সময়টায় বাড়ির অন্যান্য লোকেরা বোধহয় ঘুমিয়ে থাকে। মেয়েটি তখন স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হয়। নিজেকে তৈরি করার ফাঁকেই মেয়েটি সামনের উঠানে কিছুক্ষণ সময় কাটায়, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, ভোলা কিভাবে গাড়ি পরিষ্কার করছে। ভোলাও চোখ টেরিয়ে টেরিয়ে দেখে । মেয়েটি সাথে চোখ এক হলেই একটু মুচকী হেসে ভোলা নিজের চোখ নামিয়ে নেয়। একদিন তো বলেই ফেলেছিল, তুমি আমার দিকে অমন করে কি দেখ মেমসাব?' মেয়েটি হয়তো একুট থতমত খেয়ে গিয়েছিল, ঝট করে উত্তর দেয়, 'তোমাকে... কেমন করে তুমি গাড়ি পরিষ্কার করছ। জামাটা জলে ভিজে যাচ্ছে... তোমার কোনো হুঁশ নেই। একটু লজ্জা পেয়ে ভোলা নিজের জামাটা গুঁজে নেয় কোমরে। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমার নাম কি?' ও উত্তর দিয়েছিল 'ভোলা'। মেয়েটি হেসে বলে উঠেছিল ... তুমি বুঝি সব ভুলে যাও? কোনো উত্তর দেয় নি ভোলা। শুধু মিষ্টি করে একুট হেসেছিল। এই ভাবেই ভোলার সাথে মেয়েটির আলাপ হয়েছিল। একদিন মেয়েটি নিজে থেকেই বলেছিল, 'আমার নাম কিন্তু দিশা, তুমি আমাকে মেমসাব বলবে না... ওটাতো মা-মাসিকে বলে। আমি এখন অনেক ছোট।' ভারী মিষ্টি লাগে শুনতে ভোলার। একমুখ হাসি নিয়ে ভোলা সব কথা শোনে কিন্তু ওর মুখে 'মেমসাব' কথাটাই থেকে যায়।

রোজ সকালে এই সময়টায় ওদের দুজনে একুট গল্প হয়। এই গল্প করতে করতেই ভোলা একদিন বলেছিল 'তুমি তো মেমদের মত দেখতে। তাই আমার কাছে তুমি মেমসাহেব।' দিশা একটু হেসে বলেছিল, 'ঠিক আছে, ওই নামে ডাকতে যদি তোমার ভাল লাগে, তবে তাই ডেকো।

দিশাকে ভোলার খুব ভাল লেগেছিল, ভোলা মনে মনে ভাবত যদি ওদের বাড়িতে আরও কিছুক্ষণ থাকা যেত তাহলে হয়তো আরও বেশি সময় ধরে ও দিশাকে দেখতে পারত। ওই সকালের সময়টার জন্যই অপেক্ষা করে থাকত। দিশার বাবার একটা বড় কোম্পানীতে বড় চাকুরে ছিল, বিভিন্ন কাজে তাঁকে প্রায়ই দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে হত। দিশা ওর বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে। ওর বাবার ভীষণ প্রিয়। এই বাড়িতে ওরা তিনজন ছাড়াও ওর ঠাকুমা থাকে। এত সমস্ত কথা ভোলা দিশার কাছ থেকেই শুনেছে। দিশাও বোধহয় ভোলার সাথে গল্প করতে ভালবাসত... একদিন কথায় কথায় দিশা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমার পড়াশুনা করতে ভাল লাগে না?... তুমি এত সুন্দর দেখতে... এই গাড়ি ধুয়ে ক'পয়সা পাবে?

— 'না... না মেমসাব আমি একটা গ্যারেজে কাজ করি। পড়াশুনা করার টাকা কোথায় পাব?'

— 'কেন তোমার বাড়ি কোথায়?' আবার প্রশ্ন করে দিশা।

— 'এবার ভোলার মনটা বিষাদে ভরে যায়, মাথাটা নীচু করে বলে ওঠে, 'আমার কেউ নেই মেমসাব... শুধু ওই বিকাশদা'। চুপ হয়ে যায় দিশা স্কুলে যাবার সময় হয়ে গেছে। ভিতরে চলে যায়, ভোলাও ওর গাড়ি ধোয়া শেষ করে চাবি দিয়ে ফেরৎ চলে আসে।

হঠাৎ একদিন সকালে দিশা ওকে বলে ফেলে, 'আমি বাবার সাথে কথা বলেছি, এখানে একটা স্কুল আছে, বাবা তোমাকে সেখানে ভর্তি করে দেবে। আমি তোমাকে পড়াব।'

কথাটা শুনে ভোলা খুব খুশী হয়েছিল । একদিন দিশার বাবা ওকে নিয়ে গিয়ে একটা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। ওর বইও কিনে দিয়েছিল। ভোলা যখন ওর বিকাশদাকে সব কথা খুলে বলেছিল। বিকাশ খুব হেসেছিল, 'পড়াশুনা করে তুই লাটসাহেব হয়ে যাবি?' কিন্তু বলেনি ভোলা, তবে ওর বিকাশদার অনুমতি পেয়ে গিয়েছিল, সেই থেকে ভোলা স্কুলে যায়। ভোরবেলা উঠে দিশাদের গাড়ি ধোবে তারপর তৈরি হয়ে স্কুল যাবে, স্কুল থেকে ফিরে কিছু খেয়ে বই নিয়ে যাবে দিশার কাছে পড়তে। সন্ধ্যেবেলা গ্যারেজে কাজ করে আবার রাত্রে একটু পড়াশুনা করে শুতে যায়। এটাই ভোলার রোজকার নিয়ম হয়ে গেছে। সেদিনটা ছুটি ছিল, তাই স্কুলে যেতে হয়নি। গ্যারেজেই আরও চারটে ছেলে কাজ করে... সবাই ওর থেকে বড়, তাই ওর নাম হয়ে গেছে ছোটু, শুধু বিকাশই ওকে ডাকে ভোলা বলে।

ভোলার দিনগুলো ভালই কাটছিল। সারাদিন ধরে অপেক্ষা করত কখন স্কুলের ছুটি হলে দিশার কাছে যাবে পড়তে। ওদের বাড়িতে যাবার আগে নিজেকে একবার ভালভাবে সাজিয়ে নিত। চুলটাকে পরিপাটি করে আঁচড়ে নিত। ওর বিকাশদা ওর জন্য এক সেট ভাল জামা প্যান্ট কিনে দিয়েছিল। সেটাই ধুয়ে ইস্তিরি করেঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরত। ছুটির দিনে গ্যারেজে কাজ করতে করতেও একবার দেখে নিত দূরে তিনতলা বাড়িটার দিকে। ও জানত কখন দিশা স্নানটা সেরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ওদের তিনতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াবে। দিশাও জানত ভোলার গ্যারেজটা । এইভাবেই চলতে চলতে কখন যে দুজনের মধ্যে একটা ভাল লাগার জন্ম নিল তা নিজেরাই বুঝতে পারে নি। ওই একটু সময় দেখা - একটু পরস্পরকে কাছে পাওয়া - এর বেশি এগুবার সাহস কারোরই ছিল না। দিশা যে অনেক বড় ঘরের মেয়ে আর ভোলা? ওর ধারে কাছে যাবার যোগ্যতা নেই। হয়তো দিশা ভোলাকে পড়াতে চাইছে ওর যোগ্যতা বাড়াবার জন্য? কিন্তু ভোলার অত মন লাগে না পড়াশুনায়। ভোলার মন শুধু চায়, কোনো উপায়ে দিশারসাথে কিছু একান্ত সময় কাটাতে। পড়াতে পড়াতে দিশা নানা ধরেনর গল্প বলে ভোলা শুধু ওরমুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দিশা ধমকে উঠলে ভোলা ওর মাথাটা ঝাঁকায়। রাত্রিবেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রাস্তার ল্যাম্প পোস্টের সামনে বসে ভোলা ওর হোম ওয়ার্কগুলো করে নেয়। তারপর ওর চারপাইটা টেনে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে নানা ধরনের স্বপ্ন দেখে। এরপর কখন যে ঘুম এসে যায় ভোলা জানতে পারে না। ভোরবেলা গাড়ি চলার ঘড়ঘড়ানিতে ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

এইভাবেই দিন কেটে যায়। সময় গড়িয়ে যায়..... চার-পাঁচ বছর কেটে যায়। ভোলা তখন উঁচু ক্লাসে পড়ে। অঙ্ক করতে পারে। ইতিহাস-ভুগোল অনেক বই পড়তে হয়। ওর বিকাশদার গ্যারেজটাও অনেক বড় হয়েছে। দশ-বারোজন ছেলে কাজ করে। অনেক গাড়ি আসে মেরামৎ করতে। ভোলাকে ওর বিকাশদা এখন গ্যারেজের ম্যানেজার করে দিয়েছে। ওর কাজ এখন হিসেব দেখা। Customerদের সাথে যোগাযোগ করা, ওর বিকাশদাও চায় ভোলা নিজের পড়াশুনাকে এগিয়ে নিয়ে যাক। বিকাশের তো আর কেউ নেই... ভোলাই ওর সব। এই গ্যারেজটাকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে গেলে ভোলার একটু লেখাপড়া জানা দরকার। বিকাশেরও একটা স্বপ্ন আছে। বিকাশ চায় গাড়ির show-room করতে, বড় কোনো কোম্পানীর agency নিতে। অনেক টাকার দরকার। বিকাশ দিনরাত খেটে সেই ব্যবস্থাই করছে। কিন্তু ওর ভয় হয় ভোলাকে নিয়ে । বিকাশ জানে যে ভোলা দিশার প্রেমে পড়ে গেছে। কিন্তু দিশাকি ওকে ভালবাসে? দিশা এখন কলেজে পড়ে। আর কদিন বাদেই ওর বাবা-মা ওর জন্য কোনো ভাল পাত্র দেখবে। ভোলা সেখানে কোথায়? হতে পারে ভগবান ওকে রাজপুত্রের মত চেহারা দিয়েছে, কিন্তু দিশার ভার নেবার মত ক্ষমতা ওর কখনই হবে না। এই বিরাট আঘাতটা যখন পাবে তখন ওর মানসিক অবস্থা কেমন হবে? এই ভয়টাই বিকাশকে ভাবিয়ে তুলেছে। একদিন বিকাশ কথায় কথায় ভোলাকে নিয়ে নিজের মনের কথাটা বলে।

'দেখ ভোলা... তোকে অনেকবড় হতে হবে। তুই যদি হাল্কা প্রেমের বাঁধনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলিস, তবে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে...'

ভোলা মাথা নীচু করে সব কথা শোনে। বিকাশকেও ভীষণ শ্রদ্ধা করে... আর করবেই না কেন? ভোলার জীবনটাতো ওর বিকাশদাকে নিয়েই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ওর আজকের পরিচয় শুধু ও বিকাশদার ছোট ভাই। মাথা নীচু করেই ভোলা বলে, 'আমি বুঝতে পারছি বিকাশদা। কিন্তু দিশাকে ছাড়া আমি তো কিছু ভাবতেই শিখিনি। আমার দুটো হাত-একদিকে তুমি... আর একদিকে দিশা।'

'কিন্তু ওই হাতদুটোর ব্যবধান যে অনেক। এই ব্যবধান কমাবি কিভাবে?' বলে ওঠে বিকাশ । 'আমি জানিনা বিকাশদা তবে দিশার জন্য আমি সবকিছু করতে পারি।' জবাবদেয় ভোলা । 'ও কি জানে তোর মনের কথা?'

— ভোলা ঘাড় নেড়ে জানায় — 'না'। তারপর বলে, 'আমি বলে উঠতে পারিনি। তবে আমি বুঝি যে দিশা আমায় কাছে পেতে চায়। আমি একদিন না গেলে ওব মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। আমায় হাজারো প্রশ্ন করে।'

— কিন্তু ওর বাবা-মার সামনে তুই নিজেকে কিভাবে দাঁড় করাবি?' আবার প্রশ্ন করে বিকাশ — 'আমি জানি না...'

'কিন্তু তুই যদি মানসিক দিকথেকে ভেঙ্গে পড়িস, তবে আমার কি হবে?' একটু ধরাগলায় বলে বিকাশ, 'আমি তোকে ঘিরেই এই গ্যারেজটা সাজাচ্ছি... আমারও তো একটা স্বপ্ন আছে? তুই ছাড়া আমার কে আছে বল?... তোকে আমি হারাতে পারব না...'

বিকাশের কথাটা শেষ হয় না, ভোলা বিকাশকে জড়িয়ে ধরে, 'ও কথা তুমি চিন্তা করো না বিকাশদা। ... তুমিই তো আমার বাবা... আমার মা... এই গ্যারেজ আমার মন্দির... আমি কোথায় যাব তোমাদের ছেড়ে... একটু থেমে আবার বলে ওঠে ভোলা, 'আমি সবকথা বলব দিশাকে..... ওকে মানাবার দায়িত্ব আমার বিকাশদা। বিকাশ আর কি বলবে, মনে মনে ভগবানের স্মরণ নেয়।

ইতিমধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায় দিশার জীবনে । পড়াশুনায় ভাল ছাত্রী ছিল দিশা। Micro Biology নিয়ে পড়ার জন্য দিশার সুযোগ এসে যায় মুম্বাই-এর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে। এই সুযোগ ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাই একদিন দিশা সরাসরি ভোলার সাথে কিছু কথা বলতে চায়। রোজকার মত সেদিন যখন ভোলা হাজির হয় দিশার বাড়িতে, তখন বাড়িতে দিশা একাই ছিল। ওর বাবা-মা, ঠাকুমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছিল। দিশার পড়ার ঘরে রোজকার মত এক কাপ চা নিয়ে দিশা এসে টেবিলে পাশের চেয়ারে বসল, দিশাকে সেদিন খুব মিষ্টি দেখাচ্ছিল। দিশা কোনো ভণিতা না করেই বলল, 'আজ কিন্তু কোনো পড়া নেই। আজ একটা সুখবর তোমাকে জানাতে

চাই।' ভোলা উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে দিশার দিকে একটু হেসে বলল, 'মেমসাব, তোমাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে।' দিশা একটু মুচকী হেসে জবাব দিল, 'তোমার থেকে সুন্দর আমি নই।' কিন্তু এবার আমাদের যে ছাড়াছাড়ি হবে?' হঠাৎ একটা দমকা আশঙ্কা ভোলার মনটা অবশ করে দিল। ওর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, শুধু ছোট করে বলে উঠল, 'কেন?'

— 'আমি মুম্বাইতে একটা ভাল কলেজে সুযোগ পেয়েছি। সেখানেই চলে যাচ্ছি দু বছরের জন্য।'

— 'তাহলে আমার কি হবে মেমসাব?'

'এবার দিশা হেসে ফেলল, ভোলার আরও অনেক কাছে নিজের মুখটা এগিয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি এখন অনেক জেনে ফেলেছ, তুমি নিজেই পড়ে নিতে পারবে। মনে রাখবে আসছে বছর তোমায় মাধ্যামিক পরক্ষিায় পাশ করতে হবে। তোমাকেও কলেজে যেতে হবে।

ভোলা দিশার কথাগুলো শুনছিল, কিন্তু ওর মনের ভিতরটায় কেন জানি এক বিরাট শুন্যতা অনুভব করছিল নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি ভোলা। হঠাৎ দিশার হাতটা ওর হাতের মাঝে টেনে নিয়ে বলে, 'আমি তোমায় ছাড়া থাকতে পারব না মেমসাব' । কথাটা বলতে গিয়ে ওর গলাটা কেঁপে উঠল, চোখ দুটোও বোধহয় ছলছল করে উঠল। সেই প্রথম দিশার মনে একটা নতুন অনুভূতি এল। ভোলার দু হাতের মধ্যে ওর নরম হাতটা ধরা আছে। তাকে ছাড়িয়ে নেবার কোনো প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করল না। দিশার সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। ভোলার চোখে চোখ রেখে বলে উঠল, তুমি আমাকে এতটা ভালবাস?' ভোলা ওর হাতটা নিজের দু চোখে চেপে ধরে বলে উঠল, 'হ্যাঁ ভালবাসি'...আমার তো আর কেউ নেই বিকাশদা আর তুমি ছাড়া মেমসাব'।

এই নীরব অনুভূতির মধ্যেই কিছুটা সময় কেটে গেল, একে অপরের উত্তাপটা বুঝতে পারল। দিশা ওর হাতটা ভোলার বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে আনেনি। সেইভাবেই বলে উঠল, 'আমার জীবনটাতো তৈরি করতে হবে। তোমাকেও নিজেকে দাঁড় করাতে হবে। দুটো বছর ঠিক কেটে যাবে। তোমাকে ফিরে এসে আমি নতুনভাবে দেখতে চাই।.. তোমাকে পারতেই হবে।' একটু ধরা গলায় ভোলা বলে ওঠে, 'তুমি যদি চিরদিনের মত হারিয়ে যাও...?'

দিশা একটু মুচকি হাসে, আস্তে করে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেয়, তারপর বলে, 'ভয় নেই, তুমি হারাতে দিও না।' আর কোনো কথা হয়নি। কী-ই বা বলার ছিল ভোলার। নিজের মনকে শক্ত করে নেয়। এই জীবন সংঘাতে ওকে দাঁড়াতেই হবে। সেদিন যখন দিশার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিল, দিশা ওর দিকে তাকিয়ে আছে আর নিঃশব্দে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে।

এরপরের সময়টা ভীষণ কঠিন। দিশা চলে গ্যাছে মুম্বাইতে। ওদের বাড়িতে যাওয়াটা কিন্তু বন্ধ হয়নি ভোলার। কারণ সকালে গাড়ি ধোয়ার ব্যাপারটা ভোলা নিজের কাছেই রেখেছে। মাঝে মাঝে ওর বাবা শুভেন্দু বাবুর সাথে ওর দেখা হয়। তখনই একটু খোঁজ নেয় ওর মেমসাব কেমন আছে। নিজের পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়। গ্যারেজের কাজেও বেশ মন দেয়। অনেক customer হয়েছে। পাশের খালি - আর একটা গ্যারেজও বিকাশ নিয়ে নিয়েছে। নতুন নতুন মডেলের বড় গাড়িও আসছে। এই রকমই একদিন শুভেন্দুবাবুর নতুন 'Citi Honda' গাড়িটা এল ওদের গ্যারেজে। গাড়িটা accident করেছে বেশ কিছু কাজ আছে। গাড়ির কাজে বিকাশেরও কিছু নাম হয়েছে বাজারে শুধাংশু বাবুর গাড়িটা যেদিন delivery দেবার কথা, সেদিন তিনি নিজে এসেছিলেন ভোলার গ্যারেজে। ওদের কাজের খুব প্রশংসা করলেন। বিকাশ এই কাজের জন্য কোনো পারিশ্রমিক নিতে চায়নি । বিকাশ সরাসরি বলেছিল সুধাংশু বাবুকে। 'আপনি আমার ভাইয়ের পড়াশুনার জন্য এত করেছেন। আমি তার কিছু প্রতিদান দিতে চাই'। সুধাংশু বাবু হেসেই বলেছিলেন, 'আরে ভাই এ তো Insurance company দেবে। তোমার নিতে আপত্তি কোথায়? আর কিছু বলেনি বিকাশ। বিলটা ধরিয়ে দিয়েছিল তবে সুধাংশুবাবু সেদিন অনেক সময় দিয়ে বিকাশের গ্যারজটা ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন, তিনিই জানিয়েছিলেন যে তিনি City Honder, Marketing Manager.

এইভাবেই আরও কিছু সময় কেটে গেল। বছর ঘুরে গেল, ভোলা যেদিন ওর মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে হাজির হল বিকাশের সামনে, বিকাশ ভোলাকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরল । বিকাশের দুচোখ বেয়ে এক চরম তৃপ্তির জল নেমে এসেছিল অঝরধারায় । ভোলাও নিজেকে সংবরণ করতে পারেনি। ওর জীবনে এক নতুন উত্তরণ এল। ভোলা দেখা করল সুধাংশু বাবুর সাথে। সেই প্রথম সুধাংশুবাবু ভোলাকে নিজের সামনে বসিয়ে মিষ্টি খাওয়ালেন। অনেক কথা বললেন... গল্প করলেন... তারপর জিজ্ঞাসা করলেন 'এবার তোমার কি প্ল্যান?' একটা অকারণ বিবশতা ঘিরে ফেলেছিল ভোলাকে। ধীরে সে বলে উঠল, পড়াশুনাটা চালিয়ে যেতে চাই।

সুধাংশুবাবু বলে উঠলেন, 'খুব ভাল কথা। আমি তোমার মেমসাবকে খবরটা দিয়ে দেব।.. তবে তুমি আর গাড়ি ধুতে আসবে না। তোমাদের গ্যারেজে আর যদি কেউ থাকে, তাকে পাঠিয়ে দিও।' সুধাংশুবাবুর কথা শুনে ভোলা একটু থতমত খেয়ে গেল। সে বলে উঠল, 'এই গাড়ি ধোয়ার মাধ্যমেই তো আপনার বাড়িতে আসা যেত, এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেলে কি ভাবে আসব?.. মেমসাবও নেই যে পড়তে আসব...'

হেসে ফেললেন সুধাংশু বাবু। হঠাৎ তাঁর মনে কি হল তিনি বলে ফেললেন, 'তোমার বিকাশদাকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি কি গাড়ির শো রুম খোলার কোনো বাসনা করছেন কি। আমাদের কোম্পানী ওদের নতুন একটা brand বাজারে আনছে। তারজন্য ভাল এজেন্ট খুঁজছি... যদিও এতে কিছু অর্থ লগ্নি করতে হবে... তোমাদের গ্যারেজের কাজ খুব ভাল। আমার গাড়ির কাজটা আমাদের কোম্পানীর খুব ভাল লেগেছে। তোমাদের গ্যারেজকে আমাদের সার্ভিস সেন্টার হিসেবে অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। তুমি কথা বলো তোমার বিকাশদার সাথে... যদি তিনি চান তো আমার সাথে দেখা করতে পারেন।'

সুধাংশুবাবুর কথা শুনে ভোলার মনে একটা শিহরণ বয়ে গেল। ভীষণ খুশি মনে ফিরে এল ভোলা ওর গ্যারেজে। সুধাংশুবাবুর প্রোপোজালটা ভোলা বিকাশের সামনে রাখল। বিকাশ খুব মন দিয়ে শুনল, কোথাও যেন ওর মনে একটা ঝিলিক খেলে গেল। তবে কি ওর স্বপ্ন সফল হতে চলেছে? কিন্তু অত টাকা পাবে কোথায়? স্বপ্নটাকেও সফল করতে হবে। ভোলাও যেন একটা বিরাট কিছু স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। যদি ওরা হোন্ডাসিটি-র এজেন্সিটা পায়, যদি শো রুমটা করতে পারে, তবে হয়তো ভোলা ওর মেসাহেবের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে। বিকাশকে সরাসরি বলল, 'চল না বিকাশদা সুধাংশুবাবুর সাথে আলোচনা করি। যদি উনি কোনো ব্যাঙ্ক লোন-এর ব্যবস্থা করতে পারেন? তাহলে আমরা NF-24এর কাছে একটা শো রুম কিনতে পারব।

দুদিন এইভাবেই কেটে গেল। এর মাঝে ওরা site-এও গেছিল। একটা ভাল বড় জায়গা under construction-এ আছে। এই মুহূর্তে দশলাখ টাকা দিতে হবে এরপর মাসে মাসে কিস্তি। জায়গাটা সাজাতে হবে, ভালখরচ হবে।

মনে মনে ঠিক করে নিল বিকাশ যে এই সুযোগ ছাড়া যাবে না। দু রাত প্রায় ঘুমহারা অবস্থায় কেটে যায়। ওরা দুজনে হাজির হয়ে যায় সুধাংশু বাবুর কাছে। সেদিনটা ছিল রবিবার, ছুটির দিন। সকাল সকালই ওরা পৌঁছে গেছিল। সুধাংশুবাবু ওদের নিয়ে তাঁর বৈঠকখানা ঘরে বসলেন। বিকাশ আর ভোলা যখন ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল তখন বেলা অনেক গড়িয়েছে। বিকাশের মনটা খুশিতে ডগমগ। ওদের আলোচনাটা দানা বেঁধেছে। বিকাশের বহুদিনের দেখা স্বপ্ন হয়তো প্রতিফলিত হতে চলেছে। গ্যারেজে ফিরে বিকাশ ভোলাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে ভোলা তোর সাথে তোর মেমসাহেবর কথা হয়েছে? 'ভোলা মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দেয় — 'না।'

'সে কি রে? আজ এক বছরের উপর হয়ে গেল.. কত পরিবর্তন এল... তুই পরীক্ষায় পাশ করলি.. এবার একটা শো-রুম-এর মালিক হতে যাচ্ছিস... এত খবর? তুই জানাবি না তোর মেমসাহেবকে?' খুব কৌতূহল ভরে প্রশ্ন করে বিকাশ।

ভোলা এখন নিজেকে অনেক সংযত করে নিয়েছে। খুব সাধারণভাবেই ভোলা জবাব দিল, 'তুমিই তো আমার সব বিকাশদা... 'তুমি পাশে থাকলে আমি সব যুদ্ধ জিতে যাব, মেমসাব যখন পড়া শেষ করে ফিরে আসবে আমাকে নতুন ভাবে দেখবে..এবার আমি তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব । ভোলাকে থামিয়ে এবার বিকাশ বলে ওঠে, দাঁড়া, ওর বাবাকে আগে বাগে আনতে হবে। যেভাবে আজ কথা হল, তাতে তো আমাদের উপর সুধাংশুবাবুর প্রচণ্ড বিশ্বাস।

প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল আরও কিছুদিন। অনেক দৌড়াদৌড়ি। সুধাংশবাবুকে বিকাশ আর ভোলা সাইটে নিয়ে গেল। জায়গাটা খুবই পছন্দ হয়েছে ওনার। ব্যাঙ্কের সাথে কথা হল। বিকাশ ওর গ্যারেজটা বন্ধক রাখছে। সুধাংশুবাবু personal guarentee দিয়েছেন ব্যাঙ্কে। অনেক কাগজপত্র সই করতে হল বিকাশকে। তারপর একদিন ভোলা সাজগোজ করে গিয়ে হাজির হল সুধাংশুবাবুর অফিসে। লম্বা-চওড়া চেহারা ভোলার। স্বাস্থ্যবান একটা charming look আছে ওর। ভাল কথা বলতে শিখেছে । মিটিং ছিল সুধাংশুবাবুদের Regional Directorএর সাথে। মিটিং-এ হাজির ছিলেন সুধাংশুবাবুও। সমস্ত কাগজপত্র একটা ফাইলে নিয়ে গেছিল ভোলা। সুধাংশুবাবু ওদের গ্যারেজের উপর একটা সুন্দর writeup লিখে দিয়েছিলেন, ব্যাঙ্ক লোনের sanction letter, সেই write up এবং বিভিন্ন প্রশংসাপত্র এইসব কাগজ ভোলা রেখেছিল ওই ফাইলে। মিটিংটা সফল হল। বিকাশকে সিটিহন্ডা কোম্পানী ওদের নতুন ব্র্যান্ডের এজেন্ট হিসেবে অনুমোদন দিয়ে দিল। ফিরে এল ভোলা দিগ্বিজয় করে। গ্যারেজে অপেক্ষা করেছিল বিকাশ অনেক উৎকণ্ঠা নিয়ে। ভোলা যখন সেই অনুমোদন পত্র ওর বিকাশদার সামনে মেলে ধরল, বিকাশ আনন্দে ভোলাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। ওদের দুজনের জীবনেই এল এক নতুন উত্তরণ।

B & B Associates - এই নামেই অনুমোদনপত্র এসেছিল। এটা ওদের নতুন সংগঠন - পুরো নাম 'Bikas and Bhola Associates' এই নামেই ব্যাঙ্ক লোন এসেছে - এই নামেই ওরা NF 24 জাতীয় সড়কের ধারে নতুন বাড়িটার lease agreement করেছে। বিকাশ ওর পুরোনো গ্যারেজটাও সাজিয়েছে। নতুন কাজ পাওয়ার আনন্দে ওরা সমস্ত কর্মচারী এবং ওদের সম্মানি customerদের খাইয়েছে। সেখানে সুধাংশুবাবুও এসেছিলেন। ভোলাকে নতুন সাজপোষাকে সেজেছিল। দারুণ দেখাচ্ছিল ওকে। সারা শরীরে একটা খুশীর ঝলক ছড়িয়ে পড়েছিল। সুধাংশুবাবুর স্ত্রী তো মুখ ফসকে বলেই ফেললেন, 'তোমাকে তো রাজপুত্রের মত দেখাচ্ছে... so handsome! তোমাকে আজ 'ভোলা' বলে ডাকতেই লজ্জা করছে।' সেদিনই সুধাংশুবাবু আর একটা সুখবর ভাঙলেন। 'তোমার মেমসাব তার পড়া শেষ করে ফিরে আসছে।' খবরটা শুনে ভোলা যেন আহ্লাদে আটখানা। এইসবই বিকাশ লুকিয়ে লুকিয়ে লক্ষ্য করছিল। বিকাশের মনটাও আনন্দে ভরে উঠেছিল। ভোলাকে দেখে ওরও গর্ব হচ্ছিল। সত্যিই ভোলা এখন ওর মেমসাহেবের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে।

এরপর আরও কিছুদিন কেটে গেল। বিকাশ ওর গ্যারেজ নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকে, তাই ভোলাই নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব নিয়েছিল। ওদের নতুন শো-রুমটা সাজিয়ে তোলার ব্যাপারে । ভোলার দিনগুলো কাটছিল ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে। মনের মত করে ভোলা সাজিয়ে তুলল ওদের নতুন শো রুম। সুধাংশুবাবু মাঝে মাঝেই আসছিলেন কাজের প্রগতি দেখতে যাতে এই প্রোজেক্ট deadline এই কাজ শেষ করতে পারে। এত কাজের অবসরে ভোলা হারিয়ে ফেলে নিজেকে এক অন্তর্দহনে। কতদিন দেখা হয়নি ওর মেমসাহেবের সাথে... জানে না সে কেমন আছে — একটা অজানা সংকোচে ভোলা কখনই জিজ্ঞাসা করতে পারেনি সুধাংশুবাবু বা ওনার স্ত্রীর কাছে মেমসাহেবের কথা । ভোলার মনটায় ছেয়ে আছে ওর মেমসাহেবের মিষ্টি হাসির মুখটা... ওদের ছোট ছোট মুহূর্তগুলো। আবার হঠাৎ করে অন্য একটা শিহরণ শরীরে খেলে যায়... দু বছর পর যখন ওর মেমসাহেব ফিরে আসবে তখনই কি ওকে চিনতে পারবে আগের মত? হয়তো আরও অনেক মনের মত বন্ধু পেয়ে গেছে, তাদের নিয়েই ব্যস্ত ! ভোলার মত একটি সাধারণ ছেলের স্থান কোথায় তার নিজস্ব জগতে? তবুও ভোলার খুব দেখতে ইচ্ছে করে একবার ওর মেমসাবকে... এই দীর্ঘ কেটে যাওয়া সময়ে কি পরিবর্তন হয়েছে তার মধ্যে ? ভোলা একবার নিজের এই ঝকঝকে চেহারাটা দেখাতে চায় ওর মেমসাবকে। এখন আর সে গাড়ি ধোয় না, গাড়ি চালান সে শিখেছে, দরকার পড়লে সে নিজে মেমসাহেবকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সে যেখানে যেতে চায়। যেদিন থেকে ভোলা শুনেছে যে ওর মেমসাব ফিরে আসছে, ওর মনের স্ফূর্তিটা অনেক বেড়ে গেছে। একদিন সে কথায় কথায় বলেই ফেলল সুধাংশুবাবুর কাছে, 'স্যার, মেমসাব যবে আসবে, আমি কি ওনাকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসতে পারি?' সুধাংশু বাবু দিনের পর দিন দেখেছে ভোলাকে বেড়ে উঠতে। ওর উৎসাহ ওর প্রচেষ্টা ওর আচার আচরণ সুধাংশুকে মুগ্ধ করেছে। বলতে গেলে ভোলা এখন সুধাংশুবাবুর অন্দরমহলে ঢুকে গেছে। গাড়ি চালান শেখার পর একদিন ভোলাই সুধাংশুবাবুকে ড্রাইভ করে নিয়ে গেছে ওদের শো-রুমে। সেদিন সুধাংশুবাবুর স্ত্রী ওদের ড্রাইভারকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন তাই সুধাংশুবাবু নাচার হয়ে ভোলাকে বলেছিল, 'তোমাদের গ্যারেজ থেকে একজন ভাল ড্রাইভার দেবে, আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদের শো-রুমে?' ভোলা চুপচাপ শুনেছিল, তারপর সময়মত নিজেই হাজির হয়ে গেছিল। সুধাংশুবাবু চমকে উঠেছিলেন যখন ভোলাই ওনার কাছ থেকে গাড়ির চাবিটা চাইল- সুধাংশুবাবু শুধু বিস্ময় চোখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি গাড়ি চালাতে জান তো ভোলা?' একটু মুচকী হেসে ভোলা জানিয়েছিল, 'একবার পরীক্ষা করে দেখুন না স্যর... আমি পাশ করব না ফেল করব?' রাজী হয়েছিলেন সুধাংশুবাবু, আর দিনের শেষে ভোলার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, 'তুমি তো খুব ভাল গাড়ি চালাও ভোলা', । ভোলা খুশি হয়েছিল, কিন্তু কিছুই বলেনি। এরপর মাঝে মধ্যেই দরকার পড়লে তিনি ডেকে নিতেন ভোলাকে।

সেদিন ভোলার কথা শুনে তিনি একটু কৌতুক অনুভব করলেন । মুচকী

হেসে বললেন, 'কেন তোমার মেমসাবকে চমক দিতে চাও ? ওকে দেখাতে চাও যে তুমি গাড়ি চালাতে পার? 'ভোলা শুধু নম্রভাবে উত্তর দিয়েছিল, 'আপনি যদি অনুমতি দেন।' অনুমতি দিয়েছিলেন সুধাংশুবাবু, খুব খুশি হয়েছিল ভোলা।

ভোলার জীবনে সেই প্রতিক্ষিত দিনটি এসে গেল। ওর মেমসাব সকালের উড়ানে আসছে, সেদিন সকালে নিজেকে সাজাতে একটু সময় নিয়েছিল ভোলা। ওর বিকাশদাকে সব বলেছিল, বিকাশও খবরটা শুনে খুব খুশি হয়ে বলেছিল, 'খুব সাবধানে চালাবি, মনের আনন্দে গাড়ির accelerator-এ চাপ দিবি না।' মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ছিল ভোলা। পাটভাঙা জামাকাপড়ে নিজেকে সাজিয়ে নিল। চোখে পরে নিল ওর প্রিয় রঙীন চশমা। মনের মধ্যে চলেছে এক বিরাট শিহরণ। হাজির হয়ে গেল ভোলা ওর মেমসাবের বাড়িতে। সুধাংশুবাবু হাসিমুখে চাবিটা ওর হাতে ধরিয়ে দিলেন। ওনাদের বাড়িটাও বেশ গোছানো হয়ে গেছে, রজনীগন্ধার একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে ঘরের ভিতর থেকে। অনেকদিন বাদে ওনার মেয়ে আসছে। ভোলার সাজগোজ দেখে বেশ মজাই নিচ্ছিলেন সস্ত্রীক সুধাংশুবাবু। একটু মুচকি হেসে বললেন, 'গাড়িটা মোছার সময় জামাকাপড়টা একুট বদলে নাও। আমি একটা পাজামা দিচ্ছি।' কথাটা শুনে ভোলাও একটু লজ্জা পেয়ে গেল।

যাইহোক, ধবধবে সাদা ক্লাসিক হোন্ডা গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ভোলা, উরু উরু চেহারা, গাড়িতে গানটা বাজিয়ে দিয়েছিল, গানের সাথে নিজের সুর মিলিয়ে পৌঁছে গেল এয়ারপোর্ট। হ্যাঁ যাবার পথে একটা ফুলের দোকানে দাঁড়িয়ে রজনীগন্ধার গোছা আর একটা লাল গোলাপ নিয়েছিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দূর থেকে দেখতে পেল ওর মেমসাবকে, ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে আসছে, ওকে বোধহয় দেখতে পেয়েছে মেমসাবের চোখে রঙীন চশমা, একমুখ মিষ্টি হাসি নিয়ে এগিয়ে আসছে ভোলার দিকে। ভোলার বুকটাও যেন ঠক ঠক করে কাঁপতে আরম্ভ করেছে। ওর বহু আকাঙ্খিত মেমসাব। কি ভাবে অভিবাদন জানাবে কিছুই বুঝতে পারছে না, মেমসাব এসেই একগাল হাসি নিয়ে বলেউঠল, 'ভোলানাথ'! ভোলার মুখে কথা আটকে গেছে, নিঃশব্দে ও রজনীগন্ধার গুচ্ছটা নিয়ে ধরে ওর মেমসাহবের দিকে। হাতে তুলে নেয় ওর মেমসাব... কাঞ্চন! এরপর গোলাপ ফুলটা সামনে ধরে ভোলা বলে ওঠে, 'নমস্কার মেমসাব!' পুরমুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে গেল, ওর মেমসাব হঠাৎ করে ভোলার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে উঠল, না... আমি কাঞ্চন!' কি বলবে ভোলা? পরক্ষণেই কথাটা ঘুরিয়ে বলে উঠল, কাঞ্চন' বাবা-মা আসে নি? ভোলা একগাল হাসি নিয়ে বলল, আমাকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমাকে আনার জন্য মেমসাব।' আবার কাঞ্চন ওর মুখ চেপে বলে উঠল, 'বললাম না, আমি কাঞ্চন। তোমার মেমসাব নই।' আমাকে কাঞ্চন বল..? অনেক থতমত খেতে লাগল ভোলা। কপালে ঘামের রেখা ফুটে উঠেছে। কিন্তু কাঞ্চন ছাড়ার পাত্র নয় ভোলাকে আজ বলতেই হবে অনেক বাধা দেবার পর ভোলা ডাকল, 'ঠিক আছে... কাঞ্চন।' খুব মিষ্টি হাসি হেসে উঠল কাঞ্চন। তারপর নিঃশব্দে গাড়িতে উঠে বসল 'তুমিই চালাবে ভোলানাথ?' এবারও মুখ বুজে হেসে সম্মতি জানাল ভোলা। কাঞ্চন গাড়ি থেকে নেমে এল, বলল, 'আমি তাহলে সামনে বসব... তোমার আপত্তি নেই তো?' কিই বা বলবে ভোলা ? একটু হেসে বলল 'তোমার যদি পছন্দ হয় তো বোসো।' এবার একটু কায়দা করে কাঞ্চন বলল, 'পছন্দ...? কাকে? তোমাকে? ভোলা কিছু জবাব দিতে পারল না। হাসিমুখে ওর দিকে চেয়ে রইল, ও বুঝতেই পারেনি কাঞ্চন ওর কথার এইভাবে তর্জমা করবে। কাঞ্চন উঠে বসল সামনের সীটে ভোলার পাশে। গাড়ি ছেড়ে দিল।

ভোলার সমস্ত মন জুড়ে একটা শিহরণ, অদ্ভুত লাগছে, পাশে বসে ওর মেমসাব কাঞ্চন। একটা সুন্দর প্রসাধনের গন্ধ যেন ওকে মাতাল করে দিচ্ছে। কিছুই বলতে পারছে না। ওর কথা বলার শক্তিটা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ বাদে কাঞ্চনই বলে উঠল, আমি তোমার সব খবর পেয়েছি, আমি ভাবতেই পারিনি তুমি এত তাড়াতাড়ি আমার বাবা-মার মন জয় করে নেবে' আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। কাঞ্চন একবার বাড়িতে ফোন করে কথা বলে নিল, তারপর একটা মিষ্টির দোকানের সামনে এসে বলল, 'একটু থামবে এখানে?' ভোলা কাঞ্চনের কথা শুনে রাস্তার ধার ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল, এবারে কাঞ্চন বলে উঠল, 'তুমি স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে গেছ। তোমাকে তো অভিনন্দন জানানো হয়নি' কথাটা বলে কাঞ্চন ওর হাতটা বাড়িয়ে দিল, আরও একটু সরে এল ভোলার দিকে। ভোলা কাঞ্চনের হাতটা ওর হাতে তুলে নিল। উঃ কি নরম হাত! কখনও এই অনুভূতি আসেনি ভোলার মনে। কাঞ্চন হাসিমুখে বলল, 'অভিনন্দন!' ভোলার হাতের মধ্যে ধরা কাঞ্চনের হাত। ওর মুখে কোনো কথা নেই। কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে, কাঞ্চন চোখটা সরিয়ে বলল, 'চুপ করে আছ যে ? কিছু বল?

ভোলার মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, 'তুমি কত সুন্দর কাঞ্চন।' এবার কাঞ্চনও একটু শিহরিত হল, গলাটা নামিয়ে বলল, আমাকে তোমার এত ভাল লাগে?' কি বলবে ভোলা? ওর হাতে চাপ দিয়ে বলল, 'হ্যা কাঞ্চন !' । ওর আরেকটা হাত দিয়ে ভোলার হাতটা টেনে ওর মুখের উপর নিয়ে এল। একটা মিষ্টি আদর করে অস্ফুটে বলে উঠল, 'আমি তোমায় ভালবাসি.. I love you Bhola,' কথাটা শুনে ভোলার সমস্ত মন পুলকিত হয়ে উঠল, ওর ইচ্ছে হচ্ছিল খুব জোরে চেঁচিয়ে ও-ও বলে I do love you, Kanchan' কিন্তু একটা সম্ভ্রম ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'মিষ্টি কিনবে?' মাথাটা ঝাঁকিয়ে নেমে গেল কাঞ্চন। তারপর মিষ্টি কিনে ওরা পৌঁছে গেল কাঞ্চনের বাড়ি।

এসে গেল বিকাশের জীবনের স্মরণীয় দিন। এই দিনটাই ভোলার জীবনে আর এক উত্তরণের দিন। ওদের শো-রুমের উদ্বোধন অনুষ্ঠান । আলোর ঝলমলানিতে শো-রুমটা সেজে উঠেছে। Sterio-তে নৃত্যসঙ্গীত বেজে চলেছে। প্রচুর লোকের ভীড়, সকলেই গণ্যমান্য। বিকাশ নিজের সমস্ত clientদের নিমন্ত্রণ করেছে। বিরাট হলের মধ্যখানে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে, সেখানে সাজানো হয়েছে হন্ডা কোম্পানীর নতুন দুটো মডেল গাড়ি। বিকাশ অতিথি সৎকারে ব্যস্ত। গ্যারেজের সব ছেলেরাই বেশ সেজে এসেছে, সেজেছে ভোলাও। নিজের মনের মতন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সদম্ভে সমস্ত ঘরটা জুড়ে। এসেছেন সুধাংশুবাবু সস্ত্রীক, সঙ্গে এসেছে কাঞ্চন..... ভোলার মেমসাব একদম মনমোহিনী সাজে । কাঞ্চনের চোখে মুখে এক কমনীয় রূপ ফুটে উঠেছে। ওর মনটাও আজ ব্যাকুল নিজেকে উন্মোচন করতে, কাঞ্চন আজ সমস্ত বন্ধন খুলে ফেলতে চায় ভোলার কাছে। ভোলা আজ সত্যিকারে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। তবে কেন আর নিজেকে দূরে রাখা ভোলার দুরন্ত শরীরের গঠন ওর রূপলাবণ্য প্রথম দিন থেকেই কাঞ্চনকে আকর্ষণ করেছে। কিন্তু সে প্রকাশ করতে পারেনি। প্রতিমুহূর্তে সকলের অজ্ঞাতে ও ভোলাকে তৈরি করেছে ওর নিজের মনের মত করে। একটা সাধারণ 'ফুটপাথ বালক!' থেকে ওকে শিক্ষিত করে রূপান্তর করেছে আজকের Glamor boy ভোলানাথ রূপে। সকলের থেকে আড়াল করে কাঞ্চন শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে ভোলাকে। যতই দেখছে ততই ওর মন মোহবিষ্ট হয়ে পড়ছে। চোখের আকর্ষণে কাঞ্চন ডেকে নেয় ভোলাকে। ভোলারও মনে এক রোমাঞ্চকর শিহরণ, কিন্তু ও

জানে ওদের দুজনের মধ্যে কত বড় একটা সামাজিক ব্যবধান তৈরি হয়ে আছে, ওর চাওয়া-পাওয়ার অনেকটাই নির্ভর করছে ওদের এই সামাজিক বৈষম্যের উপর। কিন্তু ভালবাসাকে কি এই বৈষম্য বেঁধে রাখতে পারে? লুকিয়ে লুকিয়ে ভোলাও দেখছে কাঞ্চনকে। এই মানুষের ভীড়ে ভোলার চোখদুটো যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে শুধু কাঞ্চনকে। আজ যেন কোনো বাধাই মানছে না। হঠাৎই একবার চোখাচুখি হতে ভোলা বুঝতে পারে কাঞ্চনের চোখের ইশারা। ধীরে ধীরে নিজেকে আলাদা করে নেয় ভীড়ের মধ্য থেকে। সরে আসে শো-রুমের পিছনের অফিস ঘরে। বেশ সাজানো হয়েছে ঘরটা ওখানেই রাখা হচ্ছে ফুলের স্তবক। এক মুখ হাসি নিয়ে সেখানে আসে কাঞ্চন। গদগদ হয়ে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দেয় কাঞ্চন ভোলার সাথে করমর্দন করার জন্য, ভোলা হাত বাড়িয়ে দু হাতের মধ্যে কাঞ্চনের হাতটা ধরে নেয়। কাঞ্চন নিজেকে আজ যেন হারিয়ে ফেলেছে। নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার কোনো প্রচেষ্টাই নেই। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে, কোন কথা নেই। ভোলার শক্ত করে কাঞ্চনের হাত ধরে অস্ফুট বলে ওঠে... মেমসাব... আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না কাঞ্চন, নিজেকে ভোলার আরও কাছে নিয়ে এসে ভোলার মুখে হাত দিয়ে বলে ওঠে, বলেছি আমাকে আর মেমসাব বলবেনা, 'ভোলার বুকের সাথে প্রায় লেগে রয়েছে কাঞ্চনের শরীর, কাঞ্চনের নিঃশ্বাস অনুভব করছে ভোলা। এবার নিজদের ঘনত্ব আরও কমিয়ে খুব ধরা গলায় বলে উঠল, 'তুমি আমাকে একটু জড়িয়ে ধর। আরও জোরে।'

নিজেকে আজ আর রুখতে পারে না ভোলা, ও দুহাতের মাঝে টেনে নেয় কাঞ্চনকে... সজোরে চেপে ধরে ওর বুকে। কাঞ্চন নিজেকে লুকিয়ে ফেলে ওর বুকে। দুটো অতৃপ্ত হৃদয় আজ যেন পরস্পরের কাছে নিজেকে মিলিয়ে দিতে ব্যাকুল। কোনো বাঁধন মানবার দ্বিধা নেই। ওরা দুজনে আজ নতুন জীবনে পৌঁছেছে। এটাই ওদের উত্তরণ, ওদেরকে আজ বাধা দেবার কেউ নেই। সকলেই বোধহয় নীরবে মেনে নিয়েছে ওদের এই মিলন।

ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি, সীমার মধ্যে সীমা নাই।

- রবীন্দ্রনাথ

কস্ট কাটিং

কালীপদ চক্রবর্তী

- আর বলবেন না সৌমেন বাবু, মনে হয় এই অফিসে চাকরী করা যাবে না। গত আট বছর ধরে এই অফিসে আছি অথচ এরকম অবস্থা হবে কখনো ভাবিনি।

- বিনয় দা, আমারও তো প্রায় পাঁচ বছর হল। এ রকম বস আগে কখনও দেখিনি।

- বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হচ্ছে, এই বাহানায় সব কোম্পানিগুলোই সুযোগ নিতে শুরু করেছে।

- মশাই, যতটা খারাপ এ বলছে ততটা খারাপ অবস্থা এখনো হয়নি।

- শুনেছি আমাদের বস. মি. বিশ্বাস লেলে যখন থেকে এসেছেন তখন থেকেই যেন একটু বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন।

হ্যাঁ, কস্ট কাটিং, কস্ট কাটিং করে জীবনটা ওষ্ঠাগত করে তুলেছেন।

গতমাসে মহারাষ্ট্রীয়ান, মি. বিশ্বাস লেলে, M/s Veena Industriesএ Vice President, Accounts, হিসেবে জয়েন করেছেন। তিনি আসার পর থেকেই কস্ট কাটিং এর ওপর খুব জোর দিয়েছেন। কয়েকজনের চাকরীও খেয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, অফিসে চা-ও নাকি কমিয়ে দেওয়া হবে। স্টেশনারীও আরও অনেক কিছুই নাকি কমানো হবে। তাই অফিসের সব কর্মচারীদের মধ্যেই একটা চাপা রাগ, ভয় ও অসন্তোষ চলছে। তবে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, মি. রবীন চক্রবর্তী, খুবই ভাল লোক তাই সকলেই প্রায় মুখ বুঝে সহ্য করছেন। ইদানীং মিস আই.ভি. বোস, অ্যাকাউন্টসে জয়েন করাতে, মি. বিশ্বাস, তাকে নিয়েই বেশি সময় মিটিং-এ ব্যস্ত থাকেন। অন্যদের আর তেমন Importance দেন না।

সৌমেন ঃ নগেনবাবু, আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন, আজকাল মি. লেলে আমাদের না ডেকে জুনিয়ার মিস. বোসকে নিয়েই বেশি মিটিং করছেন।

নগেনবাবু - শুধু কি তাই, মিস. বোস আজকাল শাড়ি, শালোয়ার পরে আর আসছেন না, আজকাল দেখছি স্কার্ট পরে আসছেন।

নৃপেন - যেভাবে স্কার্টটা ছোট হতে শুরু করেছ তাতে মনে হচ্ছে খুব শীঘ্রই একটা বিপদ বাঁধাতে চলেছেন।

এরকম জল্পনা কল্পনা প্রায়ই লাঞ্চের সময় হয়। সবারই একটা চাপা রাগ আছে ঐ বিশ্বাস লেলের ওপর কিন্তু কেউ কিছু বলে বিপদ বাড়াতে চায় না।

আজকাল মি. বিশ্বাস লেলে আবার মিস বোসের সাথে ক্লোজড ডোর মিটিং করছেন। একদিন মিটিং থেকে মিস বোস বেরিয়ে এলে অভিজিৎ পরাটে যার পূর্বপুরুষ রাজস্থানের বাসিন্দা, কয়েক পুরুষ ধরেই এখন কলকাতায় আছেন, মিস. বোসকে জিজ্ঞাসাই করে ফেলেন - কি ব্যাপার বলুন তো? আজকাল বস, মিটিং এ আর আমাদের ডাকছেন না, শুধু আপনাকেই ডাকেন।

- কস্ট কাটিং নিয়ে মিটিং আর কি।

এভাবেই চলছিল আর প্রায়ই কস্ট কাটিং এর নামে পেন, পেন্সিল, সব বন্ধ হচ্ছিল। এমন কি হাত মোছার টিস্যু পেপারও বাথরুম থেকে উধাও হয়েছে। প্রশ্ন করলেই জবাব আসে কস্ট কাটিং। অনেকে ঠাট্টা করে বলেন বুশই ভাল ছিল, ওবামার থেকে। এভাবেই দিনগুলো কাটছিল।

হঠাৎ একদিন অফিসের ছুটির পর সকলে বেরিয়ে যাবার পরও দেখা গেল মিস. বোস বিষণ্ণভাবে বসে আছে। অফিসের প্রায় সকলেই অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে। সৌমেন বলে উঠলো — কি হল মিস বোস? বাড়ি যাবেন না?

- আজ্ঞে আমি খুব বিপদে পড়েছি কিন্তু কি করে উদ্ধার পাব জানি না।

- আরে বিপদটা না জানালে উদ্ধারের কথা ভাববো কি করে?

মিস বোস যা বললেন, সংক্ষেপে তা হল এই যে মি. লেলে ক্রমশ ঃ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন এবং আগামীকাল তাঁকে হোটেলে দেখা করতে বলেছেন। না গেলে তার চাকরীও যেতে পারে এমন হুমকিও দিয়েছেন।

মিস বোসের ইঙ্গিতে বোঝা গেল যে মি. লেলের উদ্দেশ্য মহৎ নয়।

এসব কথা যখন চলছে তখন অফিসে সৌমেন বাবু আর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পিয়ন হরি ছাড়া কেউই ছিল না। হরিও কখন তাদের পিছনে এসে কথা শুনছিল তা দুজনেই লক্ষ্য করল। হরির বয়স পঞ্চাশের বেশি হবে। মি. চক্রবর্তীর খুবই বিশ্বস্ত লোক। বহু পুরানো কর্মচারী। হরি এগিয়ে এসে বলল — তোমার কোন চিন্তা নেই দিদিমণি। তুমি খালি তোমার মোবাইল নম্বরটা আমাকে দিয়ে যাও, আর হোটেলের নাম ও রুম নম্বরটা আমাকে SMS করে দিও, বাকীটা আমি সামলে নেব। সৌমেনের মাথায় কিছুই ঢুকল না। খালি বলল - আগামী কাল সকালে কিছু একটা ভাবা যাবে। দুজনেই অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে অফিসে এসে সৌমেন অনেক চেষ্টা করেও কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছিল না। অনেকের সাথে আলোচনাও করেছে। এসব কথাতো আর সবাইকে বলা চলে না। কারণ একটা মেয়ের বদনাম না হয়ে যায়। তার ওপর মি. চক্রবর্তীও আজ অফিসে আসেন নি। হরিকেও দেখা যাচ্ছে না। হয়তো সুযোগ বুঝে ছুটি নিয়েছে। সৌমেন আর মিস বোসের দিকে তাকাতে পারছিল না। কোথায় যেন পৌরুষে বাঁধছিল। মিস বোসের মুখটা যেন ক্রমশ ফ্যাকাসে হতে শুরু করেছে। অনেকটা বলির পাঁঠার মত কাঁপছে মনে হতে লাগলো। মনে হল তাকে হয়তো আর বাঁচানো গেল না। লাঞ্চের পরেই মিস বোস অফিস থেকে বেড়িয়ে গেলেন। মিস বোস অফিস থেকে বেরিয়ে যাবার প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মি. লেলেকে অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। অন্যদেরও আর বুঝতে বাকি থাকে না যে বাঘ, হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে রওনা হল। কোন কিছু না করতে পারার অক্ষমতা সৌমেনকে খুব কষ্ট দিচ্ছিল। সৌমেন নিজেকে এত অসহায় কখনো ভাবেনি। ভাবতে থাকে, যে মেয়েটা এতদিন ধরে ওদের কথা ভাবেনি তার জন্য আজ এত সহানুভূতি কেন হচ্ছে ওর। সারারাত ভাল মত ঘুমোতেও পারেনা।

পরের দিন সকালে অফিসে পৌঁছেই দেখে সবাই যেন কেমন ফিস ফিস করে কিছু আলোচনা করছে। কিন্তু খুলে কিছুই বলছে না। শেষ অবধি জানা গেল, গতকাল মি. বিশ্বাস লেলের চাকরী গেছে কারণ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, মি. রবীন চক্রবর্তী খবর পেয়ে আগে থেকেই নির্দিষ্ট হোটেলে ওৎ পেতে ছিলেন। খবরটা দিয়ে হরিই যে শেষ অবধি মিস বোসকে বাঁচাল একথা বুঝতে সৌমেনের আর বাকী রইল না। হরির দিকে তাকাতেই হরি মুচকি হাসল। সৌমেনের বুকের একটা বেঝা যেন হাল্কা হয়ে গেল। হরির ওপর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল।

মিস বোস অফিসে ঢুকতেই সকলে উৎসুক হয়ে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল। সৌমেন বলে উঠলো — মিস বোস এরা সবাই জানতে চায় যে শেষ অবধি কি হোল?

উত্তর এল - কস্ট কাটিং। মানে বুঝলেন না? মি. লেলেকে তাড়িয়ে আমাদের Managing Director, মি. চক্রবর্তী কষ্ট কাটিং করে কোম্পানির অনেক টাকা বাঁচিয়ে দিলেন। যিনি এতদিন কস্ট কাটিং নিয়ে হৈ চৈ, করছিলেন, তিনিই এখন কস্টকাটিং-এর শিকার হলেন।

শাশুড়ীর হেঁসেল থেকে

সুস্মিতা আর্য্য

ধনে করোলা

উপকরণ ঃ ২৫০ গ্রাম করোলা, ৫০ গ্রাম আস্ত ধনে, সরষে, শুকনো লাল লঙ্কা, সাদা তেল, নুন, চিনি, তেঁতুলের পাল্প।

পদ্ধতি ঃ করোলা এবং ধনে এক সঙ্গে মিক্সিতে grind করেনিতে হবে। তারপর কড়াইয়ে সাদা তেলে (তিন/চার চামচ) সরষে এবং শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে মিশ্রণটা ঢেলে দিতে হবে। স্বাদ মতো নুন, মিষ্টি দিয়ে ভাজা ভাজা করতে হবে। নাবানোর আগে তেঁতুলের পাল্প (চার চা চামচ) মিশিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে নাবাতে হবে। গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

কাঁচা আমের করোলা

উপকরণ ঃ ২৫০ গ্রাম করোলা, দুটো কাঁচা আম, নুন, চিনি, হলুদ, সরষে, শুকনো লঙ্কা, সাদা তেল।

পদ্ধতি ঃ কাঁচা আমকে ছোট করে কেটে আগে হলুদ জলে ১০/১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। তারপর করোলা এবং আম একসঙ্গে মিক্সিতে grind করে নিতে হবে। তারপর কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে শুকনো লঙ্কা আর সরষে ফোড়ন দিয়ে ওতে মিশ্রণটা দিতে হবে। স্বাদ মতো নুন, চিনি দিয়ে নাড়তে হবে। ভাজা ভাজা হলে গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

করোলার দোর্মা

উপকরণ ঃ ৬টা লম্বা করোলা, ২০০ গ্রাম ছোলার ডাল, আদা বাটা, ভাজা জিরে গুঁড়ো, গরম মশলা, নুন, চিনি, কাঁচা লঙ্কা, সাদা তেল।

পদ্ধতি ঃ করোলার ওপরের অংশটা হাল্কা করে চেঁছে নিয়ে নুন মাখিয়ে আধা ঘন্টা রেখে দিতে হবে। এর মধ্যে ছোলার ডালের সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মিক্সিতে grind করে নিতে হবে। কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে ডালের মিশ্রণটা দিয়ে ওতে একে একে আদা বাটা, নুন, চিনি, ভাজা জিরে গুঁড়ো আর গরমমশলা দিয়ে ভালো করে নাড়তে হবে। ডালটা কষা হয়ে গেলে নাবিয়ে রাখতে হবে। আধা ঘন্টা করোলায় নুন মাখানো হলে ওগুলো জলে ধুয়ে করোলার মাঝামাঝি চিরে ভেতর থেকে দানাগুলো বার করে নিতে হবে। (ইচ্ছে হলে রেখেও দিতে পারেন) ওর মধ্যে ডালের পুর যেটা রেডী করা হয়েছে ভরে দিয়ে করোলাটাকে সুতো দিয়ে বেঁধে নিতে হবে। কড়াইয়ের মধ্যে অল্প তেল দিয়ে shallow fry করে নিতে হবে। এটা রুটি বা পরোটার সঙ্গে খেতে দিতে পারেন।

এই একই প্রক্রিয়ায় ডালের জায়গায় সোয়াবীন সেদ্ধ করেও করা যেতে পারে।

সংঘ বার্ত্তা

পৌষ মেলা নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল এসোসিয়েসনের এক অন্যতম উৎসব এবং অনুষ্ঠান। ইংরাজির ২০০০ সনে এই অনুষ্ঠানের শুরু। এরপর বিভিন্ন সময়ে এর বিভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। গত চার বছর এই উপলক্ষে এক ভব্য বইমেলার আয়োজন হচ্ছে। এবছর পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হয় ৯ জানুয়ারী শনিবার এবং ১০ই জানুয়ারি রবিবার। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় শনিবার সন্ধ্যায়। বইমেলার উদ্বোধন হয় ঐ একই সময়। দশটি পুস্তক প্রকাশক এই বইমেলায় অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে আনন্দপাবলিশার্স এবং নোভা অন্যতম। প্রবাসে বাংলা বইয়ের বিক্রয় কম হলেও প্রকাশকরা হতাশ ছিলেন না। বইমেলা ছাড়া, পৌষ মেলার অন্যান্য আকর্ষণ ছিল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাধারণ মেলা। নয়ডার প্রায় প্রত্যেক সেক্টর থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল এই অনুষ্ঠানগুলোতে অংশ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে সেক্টর-৬১, সেক্টর-৮২, সেক্টর ২৫ এবং সেক্টর ১২ প্রশংসার ভাগীদার। সাহিবাবাদ কালী বাড়ির সভ্য সভ্যা পরিবেশিত রবীন্দ্র নৃত্যানুষ্ঠান খুবই মার্জিত উপভোগ্য ছিল। এবারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এক রঙীন পালক উড়ে এসে পড়েছিল শ্রীমতী নবনীতা চৌধুরী পরিবেশিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। শ্রীমতী নবনীতা, বেগম আখতরের গাওয়া বিভিন্ন ঠুঙরী ও গজল পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন। মেলার অন্যান্য আকর্ষণের মধ্যে ছিল পুতুল নাচ, বাক্সে সিনেমা ও কুমারের হস্তশিল্পের প্রদর্শনী।

রসনা তৃপ্ত করার জন্য বাঙালির প্রিয় তেলেভাজা সিঙাড়াও পিছিয়ে ছিল না। রবিবার অনুষ্ঠানের শেষ সন্ধ্যায় NBCA মহিলা সভ্যাদের পরিবেশিত নৃত্যানুষ্ঠান যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিল। শেষ অনুষ্ঠান লটারীরও অন্য বছরের মত লোকপ্রিয় ছিল।

প্রতি বছরের মত ২৬শে জানুয়ারী ২০১৬তে সমিতির প্রাঙ্গণে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তলন হয়। এই উপলক্ষে কালীবাড়ির ছোট ছোট সঙ্গীত শিল্পীরা দেশাত্ববোধক সঙ্গীত পরিবেশন করে। দিনের শেষ অনুষ্ঠান ছিল আর্থিকভাবে অসচ্ছল মহিলাদের মধ্যে শাড়ী বিতরণ। কার্যকারী সমিতির প্রত্যক্ষ পরিচালনায় ৫০০ জন মহিলাকে শাড়ী বিতরণ করা হয়।

সরস্বতী পূজা সমিতির এক অন্যতম উৎসব। এ বছরেও মহাসমারোহে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ই ফেব্রুয়ারী পূজা এবং পুষ্পাঞ্জলির শেষে, সমিতির মহিলা সভ্যারা এক ভব্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দান করে। সবশেষে সকলে ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করেন। এবারে ছুটির দিন থাকায় লোক সংখ্যা অধিক হয়। প্রায় ২৫০০ ভক্ত ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

রক্তদান মহাদান। নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল এসোসিয়েশন প্রত্যেক বছরই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। এবছরও তার ব্যতিক্রমী ছিল না। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী সমিতির প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন ছিল। অনেক সভ্যসভ্যা এতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। যেমন Blood Sugar Checking, ECG ইত্যাদি। এই উপলক্ষে ৪০ জন স্থানীয় লোক এবং সভ্য রক্তদান করেসামাজিক দায়িত্ব পালন করেন। Rotary Club Noida এই ব্যবস্থা করার জন্য সমিতি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

শোকসংবাদ

শীতকাল অতিক্রম করা বয়স্ক মানুষের কাছে খুবই কষ্টসাধ্য। এ বছর এই সময়েই আমাদের সঙেঘর অনেক সম্মানিত ব্যক্তিকে হারাতে হয়েছে।

গত ১৫ই জানুয়ারী আমাদের কার্যকরী সমিতির সদস্য শ্রী সনৎ চক্রবর্তীর মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা প্রীতিকণা দেবী ইহধামের মায়া কাটিয়ে পরলোক গমন করেছেন।

গত ১৬ই জানুয়ারী আমাদের সদস্যা শ্রীমতি সুপ্রিয়া রায়ের পিতৃদেব শ্রী কবীন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেছেন।

গত ২০শে জানুয়ারী আমাদের সঙেঘর সহ-সভাপতি শ্রী রজত ব্যানার্জীর মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা রেখা বন্দোপ্যাধ্যায় এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে স্বর্গবাস করেছেন।

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী আমাদের সদস্য শ্রী দেবাশিষ রায়-এর পিতৃদেব শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায় পরলোক গমন করেছেন।

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী আমাদের সদস্য শ্রী সুপ্রতিম ভট্টাচার্যর পিতৃদেব শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ পরধামে গমন করেছেন।

গত ৪ঠা মার্চ আমাদের সদস্যা শ্রীমতি এ্যানি চৌধুরীর স্বামী শ্রী সত্যজিৎ চৌধুরী পরলোক গমন করেছেন।

গত ৫ই মার্চ আমাদের সঙেঘর কর্মী শ্রী প্রিয়রঞ্জনের মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা প্রতিভা সুন্দরী পরলোক গমন করেছেন।

আমরা আমাদের সঙেঘর তরফ থেকে এই সকল পূণ্যাত্মাদের আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করি। আমরা প্রার্থনা করি যেন এই সকল পূণ্যাত্মা শান্তিপূর্ণ ভাবে স্বর্গধামে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করেন।

সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী বন্ধুরা নীচের ঠিকানায় লেখাপাঠান:

সম্পাদক
সমন্বয়
নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন
ই৫ সি, কালীবাড়ী মার্গ, সেক্টর ২৬
নয়ডা ২০১৩০১
ফোন ০১২০- ২৫২২৮৩৬ / ৪৫৪৭৩৭৫

আমাদের সংঘের কনিষ্ঠ শিল্পী সদস্য-সদস্যাদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা চলছে

আমাদের সদস্যরা সমবেত সঙ্গীতে অংশ নিচ্ছেন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে

উদীয়মান শিশুশিল্পী অভিনব নৃত্যমুদ্রায়

আমাদের সঙেঘর কনিষ্ঠ নৃত্যশিল্পী পুরস্কার নিচ্ছে

আমাদের সদস্য শ্রী সাত্যকি গুহ, নিজের ছোটবেলাকে খুঁজে নিতে চাইছেন Open T-Bioscope–এ

বইমেলা উৎসবে সঙেঘর তরুণ সদস্যরা আনন্দে অনুষ্ঠান উপভোগ করছে

Published by Amiya Das, Secretary,Noida Bengali Cultural Association and printed by Delhi Paper Products.